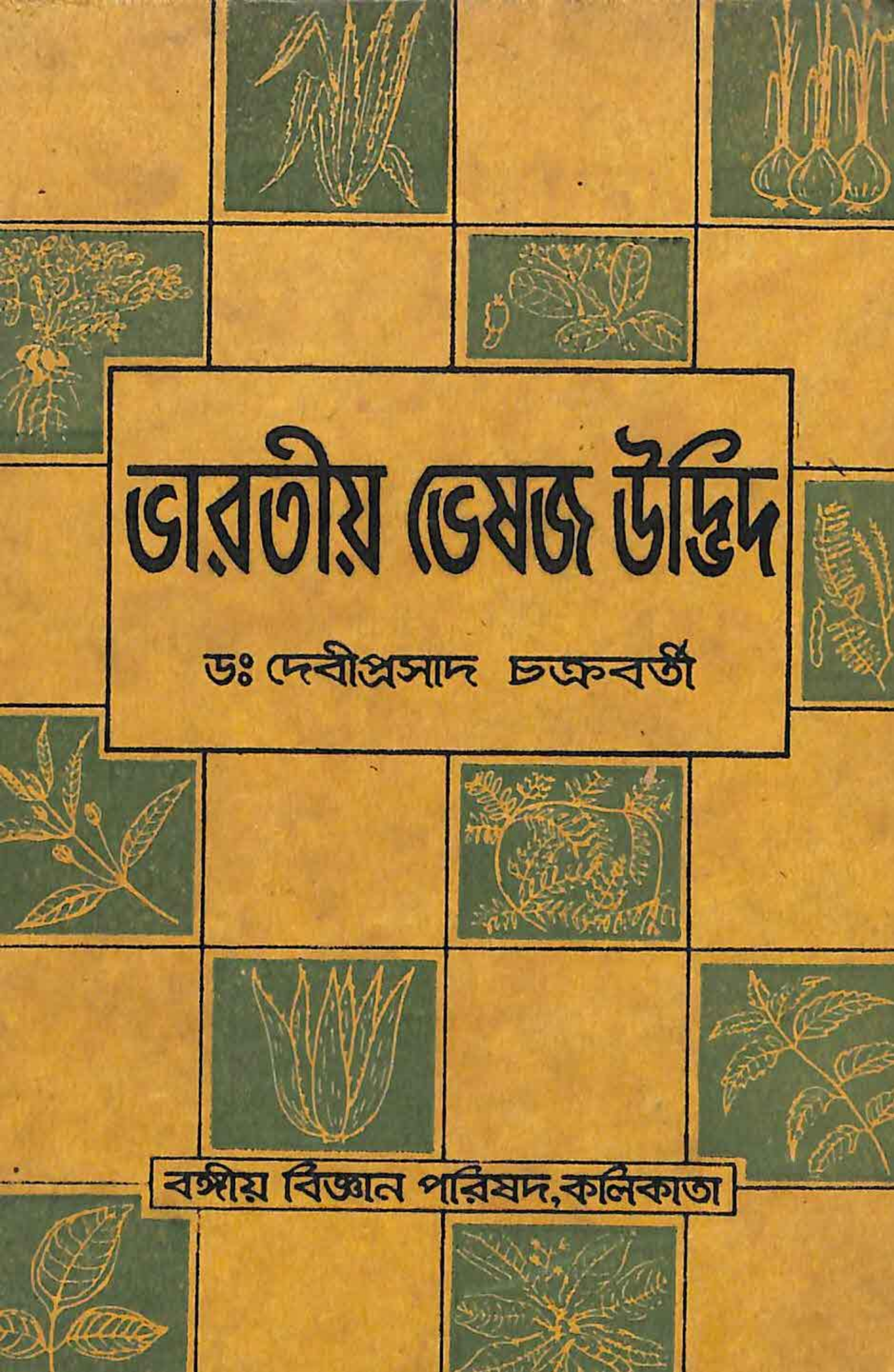


# ভারতীয় ভেষজ উদ্ভিদ

ডঃ দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, কলিকাতা

লোকবিজ্ঞান গ্রন্থমালা—

# ভারতীয় ভেষজ উদ্ভিদ



ডঃ দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম মুদ্রণ ঃ মার্চ, ১৯৬২

প্রকাশক ঃ
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

ভারত সরকারের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে বিজ্ঞান সাহিত্যে বাংলা ভাষার প্রসারকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ সাহায্যে প্রকাশিত। লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে সরকারী অর্থানুকূল্যের দরুন স্বল্পমূল্য নির্ধারিত।

মূল্য ঃ এক টাকা মাত্র



মুদ্রাকর ঃ
শ্রীহরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
২০, গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

# ভারতীয় ভেষজ উদ্ভিদ

## সূচী



———

# ভূমিকা

ভেষজ উদ্ভিদ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একটি অনন্যসাধারণ অঙ্গ। ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতিতে দেশজ উদ্ভিদ প্রাচীনকাল থেকেই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে এসেছে। ঋগ্‌বেদ, সুশ্রুত সংহিতা এবং চরক সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেয়। বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভেষজ উদ্ভিদ নবরূপ ধারণ করেছে। শুধুমাত্র রোগ-নিরাময়েই নয়, অর্থনীতিক সম্পদ হিসাবেও এই উদ্ভিদ গোষ্ঠীর কতকগুলি বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন। আজকের ভারতীয় উদ্ভিদকুলের নব রূপায়ণে বিদেশীয় উদ্ভিদগুলি বিশেষ অংশ গ্রহণ করছে। বর্তমান গ্রন্থে দেশের কয়েকটি গুরুত্বসম্পন্ন উদ্ভিদের কথা পাঠকদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। লেখার সার্থকতা হবে পাঠকদের পরিতৃপ্তিতে। সুতরাং এ গ্রন্থের বিচারের ভার রইল তাঁদের উপর।

এই গ্রন্থের অনেকগুলি রচনা প্রবন্ধাকারে জ্ঞান ও বিজ্ঞান, যুগান্তর এবং লোকসেবক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এজন্য জ্ঞান ও বিজ্ঞান-এর সম্পাদক শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, যুগান্তরের বাণিজ্য-সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী এবং লোকসেবকের বিজ্ঞান-সম্পাদক শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু আমার লেখায় সব সময় উৎসাহ দান করেছেন, এজন্য তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ন বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত এবং বিজ্ঞান কলেজের রসায়ন বিভাগের খয়রা অধ্যাপক ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের কাছে এ গ্রন্থ রচনায় সাহায্যের জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। আমার বিদেশ থাকাকালীন এ গ্রন্থ সম্পাদনার দায়িত্ব বহন করেছেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সহ-কর্মসচিব শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, এজন্য তাঁর কাছে আমি ঋণী।

১ জানুয়ারী, ১৯৬২

রসায়ন বিভাগ
ব্রণ্ডাইস বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়ালথাম ৫৪, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

**দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী**

# আনারস

ষোড়শ শতাব্দীর আগে ইউরোপ বা এশিয়ার কোথাও আনারসের কথা শোনা যায় নি। এর পর থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে এই ফল প্রচলিত হয়েছে। ব্রাজিল থেকেই এই ফল সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এত কম সময়ের মধ্যেই আনারস এত জনপ্রিয় হয়েছে যে; কোনও ফলের ইতিহাসে সেটা সচরাচর দেখা যায় না। ১৫১৩ সালে ইউরোপে এই ফল প্রথম এসেছিল। ইংলণ্ডে আনারসের কথা শোনা গিয়েছিল অলিভার ক্রমওয়েলের সময়। তারপর এর কথা শোনা গেল যখন ১৬৮৮ সালের ১৯শে জুলাই দ্বিতীয় চার্লসকে বারবাডোসের আনারস উপহার দেওয়া হলো। ভারতীয় লেখক আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবর' গ্রন্থে ভারতে আনারস উৎপাদনের কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া 'দারা শেকো'র গ্রন্থকারও ভারতবর্ষে যে আনারস পাওয়া যেত তার উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশে আনারস প্রথম এসেছিল ১৫৯৪ সালে একজন পর্তুগীজ পর্যটকের সৌজন্যে। আনারসের আমেরিকান নাম 'আনাসি বা নানাস'। এই নাম থেকে আনারস কথাটির উদ্ভব হয়েছে।

আনারস বহুবর্ষজীবী গুল্মজাতীয় গাছ। এর পাতাগুলি গোলাপের পাপড়ির মত এক জায়গা থেকে বেরিয়ে আসে। বর্শাকৃতি পাতাগুলি দু' থেকে তিন ফিট লম্বা হয় আর এর দু'ধারে কাঁটা থাকে। ফলটা ছোট ছোট পাতাগুলির মধ্যে জন্মায়। দেখলে মনে হয় যেন মুকুটের মধ্যে মুক্তার সমাবেশ। পাকলে ফলের রং হলদে থেকে ফিকে হলদে হয়।

আনারসের আদি বসতি ব্রাজিলে। আসাম, বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিম উপকূলে এর চাষ হয়। হাওয়াই ও মালয়ে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ আনারস উৎপন্ন হয়। এছাড়া মধ্য আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকাতেও বেশ কিছু মাল উৎপন্ন হয়। আনারস ব্রোমেলিয়াসি (Bromeliaceae) গোত্রের অ্যানানাস কোমোসাস লিন্ মেরিল (Ananas comosus Linn Merril) অথবা অ্যানানাস স্যাটিভা স্থলট এফ (Ananas Sativa Schult F) নামে পরিচিত।

প্রায় নব্বই রকমের আনারস আছে। এগুলিকে সাধারণতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। কুইন, ক্যানি, এবং স্পানিস। কুইন শ্রেণীর গাছগুলি বেশ শক্ত হয় আর ফসল বেশ ভাল। এই জাতের ফলগুলি তাড়াতাড়ি পেকে যায়। একটা আনারসের ওজন প্রায় তিন থেকে চার পাউণ্ড হতে পারে। ক্যানি শ্রেণীর মাল সিংহল, অষ্ট্রেলিয়া এবং হাওয়াই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ফলগুলি বেশ বড়। একটার ওজন ৫ থেকে ৬ পাউণ্ড হয়ে থাকে। ক্যানি জাতের এক প্রকার মাল কিউ। এগুলি বেশ বড় হয়। ভারতবর্ষে কিউ ও কুইন শ্রেণীর ফলের বেশ কদর।

যদিও বিভিন্ন রকমের মাটি এবং আবহাওয়ায় আনারস জন্মায়, তবে স্বল্প আর্দ্র অথচ গ্রীষ্ম অঞ্চলে গাছগুলি ভাল হয়। যেসব অঞ্চলে ৫০ ইঞ্চি বৃষ্টি সারা বছর ধরে পরিমিতভাবে হয়, সে সব এলাকা আনারস চাষের পক্ষে অনুকূল। জমিতে জল জমা আনারসের পক্ষে ক্ষতিকর। যেসব দোঁয়াশ মাটিতে বালির ভাগ বেশী, সে রকম মাটিতে আনারস বেশ ভালভাবে জন্মায়। সাধারণতঃ আনারসের জন্মানোর পক্ষে ৬০-৯০ ডিগ্রি ফারেনহাইট উষ্ণতা বিশেষ প্রয়োজন। ভারতের পশ্চিম উপকূলের ফসল ক্যানিং-এর জন্য বিশেষ উপযুক্ত। আনারসের

অমসৃণ চোখগুলি এবং আঁশযুক্ত খোসাগুলি ক্যানিং শিল্পের অন্তরায়। ক্যানিং হওয়ার পর আনারসের ফালতু টুকরাগুলি গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। শক্তিসৃষ্টির সুরাসারও আনারসের রস থেকে প্রস্তুত করা সম্ভব।



আনারসের পাতা থেকে সুন্দর আঁশ প্রস্তুত করা যেতে পারে। এর সুতো থেকে প্রস্তুত রুমাল সিল্কের রুমালের মতো। এক টন আনারসের পাতা থেকে ৫০ থেকে ৬০ পাউণ্ড সুতো পাওয়া যায়। আনারসের সুতো সিল্কের মত চকচকে, শক্ত এবং জলে নষ্ট হয় না। তবে এর তৈরীর খরচ অনেক বেশী। সাধারণতঃ দু'বছরের পাতাগুলি আঁশ তৈরীর জন্য নেওয়া হয়। সবুজ অংশগুলি ছাড়িয়ে আঁশগুলি জলে ভিজিয়ে দেওয়া হয়। এর পর রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এই রকম বার বার করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সুতো বেশ চকচকে হয়। ফিলিপাইন অঞ্চলে বেশ সুন্দর এবং মূল্যবান কাপড় এই সুতো থেকে তৈরী হয়। সুতো তৈরীর পর যে বাড়তি মালটা পড়ে থাকে তা কাগজ তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হয়।

কাঁচা আনারসের রস ভাল জোলাপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া এটি অপরাধাত্মক কাজে ব্যবহৃত হয়। রমণীদের এই রস গ্রহণে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। আনারসের পাতার রস পেটের নানা রকম উপসর্গে ব্যবহৃত হয়। পাকা ফল স্কার্ভির বিরুদ্ধে ব্যবহার্য। পাকা ফলের রস মূত্র বৃদ্ধি করে। টাটকা পাকা ফলের রসে 'ব্রোমেলিন' নামে একটা এনজাইম আছে। এটি পরিপাক ক্রিয়ায় বিশেষ সহায়ক। আনারসের পাতার রসে ক্রিমি রোগ ভাল হয়।

গাছের বংশবৃদ্ধি হয় বিভিন্ন অংশ বুনে দিয়ে। জুলাই ও আগষ্ট মাসে অংশগুলি মাঠে লাগিয়ে দেওয়া হয়। দুটি সারিতে পাঁচ ফিট পর পর এগুলি লাগানো হয়। দুটি সারির মধ্যে ব্যবধান থাকে ১½ থেকে

২ ফিট। জমির আগাছা পরিষ্কার করা, নিয়মিতভাবে পাতাগুলি কেটে দেওয়া চাষের বিশেষ অঙ্গ। আনারস চাষের জন্য জমিতে অ্যামোনিয়াম সালফেট, পটাসিয়াম সালফেট এবং সুপারফসফেট ১ঃ২ঃ৩ অনুপাতে মিশিয়ে সার দেওয়া হয়। এক একর জমির জন্য এই মিশ্রণের প্রয়োজন ৬০০ পাউণ্ড।

ফলটা যখন ফিকে সবুজ কিংবা গোড়ার দিকটা একটু হলদে হলদে হয়, তখনই ফসল তোলার উপযুক্ত হয়। একটু কম পাকা ফল স্বাদে ও গন্ধে নিম্নস্তরের হয়। ফলের ফলন সব জায়গায় সমান হয় না। হাওয়াই দ্বীপে এক একর জমিতে ৪০ টন মাল উৎপন্ন হয়, কিন্তু অন্যান্য জায়গায় ৬ থেকে ১০ টন মাল উৎপন্ন হয়।

সাধারণতঃ বিভিন্ন রকম কীট-পতঙ্গ এবং ছত্রাকের আক্রমণ আনারস চাষের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। ভারতে ফসলে কীট-পতঙ্গের আক্রমণ বড় একটা বিশেষ হয় না, ছত্রাক থেকে কতকগুলি রোগের সৃষ্টি হয় বলে জানা গিয়েছে।

শতকরা ৮০-৮৫ ভাগ ফসল ক্যানিং শিল্পে ব্যবহৃত হয়। একমাত্র হাওয়াই দ্বীপে ২০০,০০০ টন আনারস ক্যানিং-এর জন্য ব্যবহৃত হয়। এই এলাকার আনারসের পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে এতে শতকরা ৬৫.৭ ভাগ খাবার উপযুক্ত রস আছে। রসের মধ্যে শর্করা জাতীয় পদার্থ ৪.৬% ফলের জল ৮৫.৫%, প্রোটিন ০.৬%, শর্করা জাতীয় পদার্থ ২.০%, অজৈব পদার্থ ০.৫% ক্যালসিয়াম ০.০২%, ফসফরাস ০.০১%, আয়রন শতকরা ০.৯ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-এ ৬৩ ইউনিট ও ভিটামিন সি শতকরা ৬৩ মিলিগ্রাম।

---

# ওলট কম্বল

গত শতাব্দীর বিশিষ্ট উদ্ভিদ বিজ্ঞানী রক্সবার্গকে ওলট কম্বলের গাছ স্বপ্নালু করে তুলেছিল। ওলট কম্বলের বাকলের আঁশগুলি পাট কিংবা শণ থেকে বড় হয় এবং বেশ চকচকে। অতি সহজেই এই আঁশগুলি বাকল থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া যায়। তাই রক্সবার্গ ভেবেছিলেন হয়ত ওলট কম্বলের আঁশ পাট কিংবা শণের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু বস্ত্র শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণিত হয়েছে রক্সবার্গের স্বপ্নের বিফলতা। ওলট কম্বলের আসল কদর হচ্ছে বনৌষধি হিসাবে। পুরাকাল থেকে মেয়েদের যৌনচক্রের সাধারণ গতিবিধির ব্যতিক্রমে এই বনৌষধি বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

ওলট কম্বল বাংলা, হিন্দী এবং কচ্ছ ভাষায় একই নামে পরিচিত। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে এই গাছ 'অ্যাব্রোমা আগষ্টা লিন' ( Abroma augusta Linn ) নামে পরিচিত এবং এই গাছ ষ্টেরকিউলিয়াসি ( Sterculiaceae ) গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। অ্যাব্রোমা কথাটা এসেছে গ্রীক ভাষা থেকে। এর অর্থ হচ্ছে খাদ্য হিসাবে অনুপযুক্ত। ছোট ছোট ঝোপ হিসাবে গাছগুলি জন্মে। বন্যভাবেই গাছগুলি জন্মায়, তবে সিকিম, উত্তর প্রদেশ এবং আসামের কোনও কোনও জায়গায় ওলট কম্বলের চাষ হয়। গাছটি খানিকটা লম্বা, কাণ্ডের বাকল আঁশযুক্ত, ফুলের পাপড়ি লাল এবং ফুলগুলি ছোট ছোট। বর্ষাকালে ফুল ফোটে আর বীজ পাকে শীতকালে।

ভারতীয় চিকিৎসকগণের বিভিন্ন রকম মতামত থেকে জানা যায় যে, বাধক রোগে এই গাছের শিকড়ের ছাল ব্যবহার হয়ে থাকে।

ডাঃ ভুবনমোহন সরকার ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেটে ( ১৮৭২ ) এর ব্যবহারের বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর ধারণা হচ্ছে যে, সম্ভবতঃ শিকড়ের ছাল থেকে এক রকমের কষ বের হয় এবং তার উপর নির্ভর করে ওলট কম্বলের রজোনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। ডাঃ ম্যাকলিয়ড পুরানো অনেক বিশারদের মত উল্লেখ করেছেন যে, শোণিত সঞ্চয় প্রবণ বাধকে ওলট কম্বল বেশী কার্যকরী। ডাঃ কার্তিক বসু এই মত প্রকাশ করেছেন যে, ওলট কম্বলের শিকড়ের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায় সুরাসার কিংবা অনুরূপ জৈব দ্রাবকের প্রভাবে। এর জন্য সদ্য সদ্য সংগৃহীত শিকড় কিংবা শিকড়ের ছাল ব্যবহার করা শ্রেয়।

রাসায়নিক পরীক্ষা করে ডাঃ চোপরা দেখেছেন যে, ওলট কম্বলের ছালে খানিকটা উপক্ষার থাকে। এছাড়া এতে জলে দ্রবণীয় ক্ষার পদার্থ এবং কিছু পরিমাণ ম্যাগনেসিয়াম লবণ থাকে। তাঁর অভিমত হচ্ছে যে, এই ম্যাগনেসিয়াম লবণের উপর নির্ভর করে গর্ভাশয়ের রক্তস্রাবজনিত রোগে ওলট কম্বলের কার্যকরিতা। ওলট কম্বল নানা রকম স্ত্রীরোগে অন্যান্য ঔষধের সংমিশ্রণে ব্যবহৃত হয়।

---

# কাজু বাদাম

ভারতবর্ষে কাজুবাদাম প্রথম এসেছিল ব্রাজিল থেকে পর্তুগীজদের সঙ্গে। কাজু কথাটা এসেছে ব্রাজিলের 'Acaju' শব্দ থেকে। পর্তুগীজগণ Acaju কথাটা কাজু বলে উচ্চারণ করত। বিগত শতাব্দীর বিবরণীতে পাওয়া যায় যে, কঙ্কণ উপকূলেই এই বাদাম কাজু বাদাম নামে পরিচিত ছিল। কারণ পর্তুগীজগণ এই নাম প্রচার করেছিল। ফরাসীগণ Acajuকে ক্যাস্থ নামে অভিহিত করত। তাই থেকে ইংরাজীতে এই বাদাম ক্যাস্থ নাট নামে পরিচিতি লাভ করেছে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে কাজু বাদামের গাছ 'অ্যানাকারডিয়াম অক্‌সিডেণ্টাল লিন্' ( Anacardium Occidentale Linn. ) নামে পরিচিত। এটি অ্যানাকারডেসি ( Anacardaceae ) গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

কাজু বাদামের গাছ বেশ বড় হয়। এগুলি প্রায় চল্লিশ ফিট উচু হয়। গাছে সব ঋতুতেই পাতা থাকে। ছাল বেশ অমসৃণ আর এর ফলগুলি অদ্ভুত ধরণের। গোটা ফলটার দুটো অংশ—উপরের দিকটা বেশ মাংসল বড় রকমের ফল, এই অংশকে কাজু ফল বলা হয়। নিচে থাকে কিডনির আকারের একটা বাদাম। এই অংশ কাজু বাদাম নামে পরিচিত। কাজু ফল ২ থেকে ৩½ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। এর উপর দিকটায় থাকে পাতলা চকচকে হলদে রঙের খোসা। কাজু বাদামের শাঁস শাদা ধরণের। শাঁসটা শক্ত, মসৃণ এবং চকচকে খোলা দিয়ে ঘেরা থাকে।

কাজু গাছ সাধারণতঃ পেরু, ব্রাজিল ও মেক্সিকো অঞ্চলে জন্মে। মাদাগাস্কার, দক্ষিণ আফ্রিকার মোজাম্বিক, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সিংহল

এবং ফিলিপাইনে এই গাছ বেশ জন্মে। ভারতবর্ষে বোম্বাইয়ের উত্তর কানাড়া ও দক্ষিণ কানাড়া অঞ্চলে, মাদ্রাজের মালাবার জেলায়, পশ্চিম ভারতীয় উপকূলে কেরালা অঞ্চলে এর বেশ চাষ হয়। এ ছাড়া উড়িষ্যার বালেশ্বর, গঞ্জাম, বাংলাদেশের মেদিনীপুর এবং মহীশূরেও এই গাছের চাষ হয়।

কাজু বাদামের গাছ সাধারণতঃ শক্ত এবং শুষ্ক আবহাওয়া সহনশীল, কিন্তু হিমকাতর। বিভিন্ন রকমের আবহাওয়া ও মাটিতে এই গাছ জন্মে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি মাটিতে একটু বালি মেশানো থাকে। ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে বৃষ্টি হয় বছরে ১২০-১৫০ ইঞ্চি। এখানকার মাটিতেই এই গাছ জন্মে। পূর্ব উপকূলে বালি মাটিতেও এই গাছ ভালই জন্মে, যদিও এই অঞ্চলে বারিপাত হয় বছরে ৩৫ ইঞ্চি। পাহাড়ী অঞ্চলেও যে সব এলাকা পাথুরে এবং শুষ্ক বলে বিবেচিত হয় সে সব জায়গাতেও এই গাছ জন্মে।

সাধারণতঃ বীচি থেকেই গাছ হয়। কিন্তু কলম লাগিয়েও এর চাষ করা হয়। আমাদের দেশে এর চাষের জন্য যত্ন প্রায় নেওয়াই হয় না। দক্ষিণ কানাড়া এবং সিংহল অঞ্চলে সাধারণতঃ কৃষকেরা মাটি খুঁড়ে কয়েকটা বীজ বুনে দেয়। পরে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে কয়েক পসলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর এবং চারা জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে ভাল চারাগুলি রেখে দেওয়া হয়। একমাস পরে চারা বড় হলে ঝুড়ি শুদ্ধ ৩০-৪০ ফিট পর পর গাছগুলি পুঁতে দেওয়া হয়। এক একরে ১০০টি গাছ পোতা হয়। কিন্তু কোথাও কোথাও এক একরে ৫০ থেকে ২০০টা গাছও পোতা হয়।

তিন বা চার বছর বয়সকাল থেকে গাছগুলি ফল দিতে আরম্ভ করে। দশ বছর বয়সে ফলন হয় সবচেয়ে বেশী। এর পর আরও কুড়ি বছর পর্যন্ত ফলন হয়। ডিসেম্বর মাসে ফুল ফোটে। প্রায় তিন

মাস ধরে ফুল ফুটতে থাকে। ফলগুলি পাকতে দু-তিন মাস লাগে। খুব বেশী পাকবার আগেই ফলগুলি সংগ্রহ করা হয়। সংগ্রহটা আরম্ভ হয় ফেব্রুয়ারীতে, আর শেষ হয় জুনের প্রথম দিকে। একটা গাছ থেকে ১০০ পাউণ্ড পর্যন্ত বাদাম সংগ্রহ করা যায়। পশ্চিম উপকূলে প্রতি গাছে ৩০ পাউণ্ড এবং উড়িষ্যায় ৪০ পাউণ্ড পর্যন্ত বাদাম সংগৃহীত হয়ে থাকে।



কাজু বাদামের গাছ

কাজু বাদামের কদর তার শাঁস আর খোলার তেলের জন্য। মাদ্রাজে পানরুতি ও নেলোর অঞ্চলে বাদামগুলি সূর্যের তাপে শুকিয়ে খোলা ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে খুব সামান্য পরিমাণ বাদামেরই খোসা ছাড়ানো হয়। তার প্রধান কারণ হচ্ছে ভাজা

শাঁসের চাহিদাই বেশী। ভাজা শাঁসগুলি গন্ধে আর স্বাদে বেশ মনোরম। কিন্তু ভাজবার পদ্ধতি বেশ কঠিন। ভাজবার সময় সর্বদাই লক্ষ্য রাখতে হয় যাতে কম বা বেশী ভাজা না হয়ে যায়। ঠিকমত ভাজা না হলে বাদামের কদর কমে যায়। খোলার তেলের জন্য সাবধান বেশী হতে হয়। জালের ট্রেতে করে খোলা ও বাদামগুলি একটা গরম তাপের খোলার তেলের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করিয়ে নেওয়া হয়। এর ফলে খোলার তেলটা বেরিয়ে পাত্রের তেলের মধ্যে জমা হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাদাম ভাজা হয়ে যায়। এর পর খোলা ভেঙে বাদাম বার করা হয়। ভাঙবার সময় বেশ সাবধান হতে হয়।

কিডনির মত বাদাম ছাড়া কাজু বাদামের উপরের অংশ 'কাজুয়াল' নামে পরিচিত। পাকলে এই ফল খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি গাছ থেকে প্রায় ৭৫ পাউণ্ড ফল প্রতি বছর পাওয়া যায়। ভারতে বাৎসরিক প্রায় ৪৫ লক্ষ মণ ফল উৎপাদন হয়। ফলের রস থেকে মদ তৈরী হয়। তবে উৎপন্ন ফলের খুব কম অংশই এই কাজে লাগানো হয়। মাদ্রাজের শিল্প বিভাগ কাজু ফল থেকে সোনালী-হলদে রঙের গন্ধবিহীন এক রকম সিরাপ তৈরীর পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। পাঁচ-ছয়টা ফল থেকে এক আউন্স সিরাপ পাওয়া যায়। এই সিরাপ থেকে মদ তৈরী সম্ভব। শোনা যায়, ১৯৩৮ সালে যখন বোম্বাইয়ে মাদক দ্রব্য বর্জন হয়েছিল তখন রতনগিরি জেলায় কাজু ফল মদ তৈরীর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো। এ ছাড়া ফল থেকে ভিনিগার তৈরী করা যায়।

কাজু বাদামের শাঁসের খোলা এবং কাজু বাদামের বিভিন্ন অংশের রাসায়নিক পরীক্ষা করা হয়েছে। শাঁসের পরীক্ষায় দেখা যায় যে, এতে প্রোটিন ২১·১%, জল ৫·৯%, তৈল জাতীয় পদার্থ ৪৬·৯%, শর্করা জাতীয় পদার্থ ২২·৩%, অজৈব পদার্থ ২·৪%, ক্যালসিয়াম ০·০৫%, ফসফরাস ০·৪৫% ও লৌহ শতকরা ৫ মিলিগ্রাম।

রাসায়নিক দিক থেকে কাজু বাদামের অন্যান্য অংশের তুলনায় খোলার তেল উৎসাহ সৃষ্টি করেছে বেশী। ১৯৩২ সালে হার্ভে ও চ্যাপলিনের গবেষণার ফলেই এই তেলের বাণিজ্যিক গুরুত্ব বেড়েছে। বাজারে খোলার যে তেল রোষ্ট করা বাদাম থেকে পাওয়া যায় তা ভাল ঈথার দিয়ে নিষ্কাশিত তেল থেকে ভিন্ন রকমের। এর মধ্যে কারডল ও অ্যানাকারডিক অ্যাসিড নামে দুটি রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ আছে। অ্যানাকারডিক অ্যাসিডের অনেকগুলি অণু সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বৃহৎ অণু সৃষ্টি করতে পারে বলেই খোলার তেলের বহুবিধ ব্যবহার সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া অ্যানাকারডিক অ্যাসিড এবং ফরম্যালডিহাইড মিলিয়ে রজন ও প্লাষ্টিক জাতীয় পদার্থ তৈরী করা সম্ভব। এটি রবারের মত, কিংবা অনুরূপ শক্ত তাপসহনশীল জিনিসের সৃষ্টি করে এবং অনেক রকম রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা আক্রান্ত হয় না। এইজন্য বিভিন্ন রকমের বার্নিশ, মেজের টাইল, সিমেণ্ট এবং অ্যাডাসিভের উপাদান হিসাবে অয়েল ক্লথ, তিসির তেল বা টাঙ তেলের সঙ্গে মিশিয়ে এক রকম তেল তৈরীতে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। অ্যানাকারডিক অ্যাসিড জীবাণু বৃদ্ধি রোধ করতে পারে। মশার লার্ভা ধ্বংসের ব্যাপারে কেরোসিনের সঙ্গে শতকরা ৫ ভাগ তেল মিশিয়ে মশার বিরুদ্ধে ছড়ালে এটি বিশেষ কার্যকরী হয়। এ ছাড়া কুকুরের হুক্‌ওয়ার্ম, ক্রিমি প্রভৃতি রোগে এটি ব্যবহার করে আশাপ্রদ ফল পাওয়া গিয়েছে।

ফলের রাসায়নিক পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, এতে জল ৮৭·৯%, প্রোটিন ২%, শর্করা জাতীয় উপাদান ১১·৩%, তৈল জাতীয় উপাদান ০·১%, অজৈব উপাদান ০·২%, আয়রন ০·২ মিলিগ্রাম %, এ ছাড়া ভিটামিন সি ২৬১·৪ মিলিগ্রাম % এবং কেরোটিন ০·০৯% এতে আছে।

ভারতে উৎপন্ন বাদামের ২৫% বাদাম (শাঁস) দেশে ব্যবহৃত হয় আর ৭৫% বিদেশে রপ্তানী করা হয়। ভারতের বাজারে বাদামগুলি খোসা শুদ্ধই বিক্রি হয়। রপ্তানীর মালে খোসা থাকে না। বাদামগুলি বাছাই করে লবণ দিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইডপূর্ণ টিনে করে চালান দেওয়া হয়। খোসা ছাড়ানো এবং বাছাই সব হাতে করা হয়।

যদিও পূর্ব আফ্রিকা এবং ব্রাজিলে যথেষ্ট কাজু বাদাম উৎপন্ন হয়, একমাত্র ভারতবর্ষ থেকেই বাদাম লবণ দিয়ে খাবারের উপযুক্ত করে চালান দেওয়া হয়। কাজু বাদামের রপ্তানীর কারবারও আরম্ভ হয়েছে অল্পদিন হলো। ১৯২৫ সালে মাত্র ৫০ টন মাল বিদেশে রপ্তানী হয়েছিল। বর্তমানে এর পরিমাণ অনেক বেশীতে দাঁড়িয়েছে। রপ্তানির ক্ষেত্রে উদ্ভিজ দ্রব্যের মধ্যে চায়ের পরই কাজু বাদামের গুরুত্ব। রপ্তানীর ৮০% যায় আমেরিকায়, অবশিষ্ট মাল চালান হয় ক্যানাডা, ইংলণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়ায়।

খোলার তেলের গুরুত্ব বেড়েছে খুবই অল্পদিন হলো। খোলার তেলের অর্থ নৈতিক দিকটা বিশেষ আশাপ্রদ।

কাজু বাদামের শাঁসের খোসা ও ভগ্ন অংশ বছরে প্রায় বিশ হাজার টন পাওয়া যায়। এগুলি গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। গাছ থেকে হলদে আঠা জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। এগুলির পোকামাকড় ধ্বংস করবার ক্ষমতা আছে এবং বই বাঁধায়ের কাজে ব্যবহৃত হয়। এর কাঠ লালচে রঙের এবং বেশ শক্ত। এক কিউবিক ফুট কাঠের ওজন ৩০-৩২ পাউণ্ড। সিংহল ও ব্রহ্মদেশে প্যাকিং বাক্স ও ছোট ছোট নৌকা তৈরীর জন্য এই কাঠ ব্যবহৃত হয়।

# কুঁচ

কথিত আছে, শাজাহানের কোহিনূর প্রথমে ওজন করা হয়েছিল রতি দিয়ে। অনেকে মনে করেন, এই থেকেই আরবী কথা কিরাত এবং তা থেকে সৃষ্টি হয়েছে ক্যারেট শব্দটির। এক আউন্সের ১/২৪ ভাগ হচ্ছে ক্যারেট। সাধারণতঃ ভারতীয় মান অনুযায়ী রতির ওজন ধরা হয় ১·৭৫ গ্রেণ। এই হিসাবে ক্যারেট দাঁড়ায় প্রায় দু'রতির সমান। রতি হচ্ছে কুঁচের লাল বীচি। ভারতীয় স্বর্ণকারগণ এই রতি দিয়ে সোনা ওজন করে থাকেন। হয়তো কুঁচের বীচি পেকে একটা ঠিক ওজনে আসে বলে রতির এইরূপ ব্যবহার। শুধু মাত্র ভারতের সব জায়গাতে নয়, জাভা এবং মালয়েও এই রীতি প্রচলিত হয়েছিল। রতির এই রকম ব্যবহার নিশ্চয়ই কোনও বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি দ্বারা সমর্থন করা যায় না। কুঁচের বীচি বিশেষ করে লাল বীচি কৃষক বধূর অঙ্গের আভরণ হিসাবে শোভা পায়। সন্ন্যাসীদের জপমালায় রতির ব্যবহার হয় প্রচুর পরিমাণে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে কুঁচ 'অ্যাব্রাস প্রিকেটোরিয়াস লিন্' ( Abrus precatorius Linn ) নামে পরিচিত। অ্যাব্রাস কথাটা এসেছে গ্রীক ভাষা থেকে। এর অর্থ হচ্ছে 'সুন্দর'। হয়তো রতি কিংবা কুঁচের পাতা এবং গাছের সৌন্দর্যের জন্য এই নাম দেওয়া হয়েছে।

ভারতের প্রায় সব অঞ্চলেই ৩৫০০ ফুট উঁচু জায়গা পর্যন্ত এই গাছ জন্মে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই গাছ বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দীতে রতি, চর্মিতি, গুঞ্জি ; বম্বেতে গুঞ্জা, বাংলাদেশে কুঁচ, আরবী ভাষায় আইন-উদ-দিক ( মুরগীর চোখ ) নামে পরিচিত।

রক্তবার্গ তিন প্রকার গাছের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমগুলির গোলাপী রঙের ফুল, লাল বীচি আর তাতে কালো চোখ। দ্বিতীয় প্রকারের কালো রঙের ফুল, কালো বীচি আর তাতে শাদা চোখ। এর মধ্যে লাল রঙের বীচিই বেশী পাওয়া যায়। এই লাল রকমের কুঁচ রক্তিকা, কাকসিঞ্চি, কাকদনী, অঙ্গারবল্লী নামে পরিচিত।

গাছটি লতায়িত হয়ে ওঠে, পাতা, ফুল আর বীচিতে মিলে গাছটি সব সময়ের জন্যই সুন্দর দেখা যায়। শিকড় বেশ শক্ত আর এর অনেক শাখা প্রশাখা আছে। এর ছাল খুব পাতলা আর লালচে, কাঠ শাদা। শিকড় ভাঙলে প্রথমে এক রকম অদ্ভুত গন্ধ পাওয়া যায়। শিকড় প্রথমে তেতো পরে মিষ্টি স্বাদ যুক্ত।

কুঁচের বিভিন্ন অংশের ব্যবহারের কথা পুরাকাল থেকে জানা আছে। শিকড় থেকে আরম্ভ করে বীচি পর্যন্ত প্রত্যেকটি অংশের কিছু না কিছু ব্যবহার আছে। সর্দি, কাশিতে শিকড়ের ব্যবহার হয়। গলা ভাঙার ওষুধ হিসাবে শিকড় চিবিয়ে খাওয়া হয়।

সবচেয়ে বেশী ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায় কুঁচের বীচির। ইউ সি দত্ত তাঁর সংস্কৃত মেটেরিয়া মেডিকাতে উল্লেখ করেছেন যে, বীচি গুঁড়া করে বিভিন্ন রকমের স্নায়ুরোগে ব্যবহৃত হয়। চর্মরোগ এবং চুলের শ্রীবৃদ্ধিতে এর প্রচলন আছে। চুলের শ্রীবৃদ্ধির ব্যাপারে বীচি গুঁড়া করে অন্যান্য কয়েকটা গাছ গাছড়া আর রাসায়নিক যৌগিকের সহযোগে ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। আয়ুর্বেদ সংগ্রহে কুঁচের বীচির টাকনাশক গুণ আছে বলে উল্লেখ আছে। বীচিগুলি জোলাপ হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং পুরানো পুঁথিপত্রে এই গুণাবলীর বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে। তবে এই ব্যবস্থার জন্য বেশী করে বীচি

খেলে বিষক্রিয়া আরম্ভ হয়। কুষ্ঠ রোগের বিরুদ্ধে কুঁচের ব্যবহারের কথা আয়ুর্বেদ সংগ্রহে উল্লেখিত আছে।

গরুকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলতে কুঁচের বীচির ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রামে অনেক সময় চামড়ার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিরা গরুর চামড়া ও হাড় সংগ্রহের জন্য কুঁচের বিষ দিয়ে গরু মেরে ফেলে।



কুঁচ গাছ

এই ব্যাপারে কুঁচের বীচিগুলি গুঁড়া করে সূঁচের আকারে করে নেওয়া হয়। তারপর সেটাকে রোদে শুকিয়ে বেশ শক্ত করে তীরের সাহায্যে গরুর দেহে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। দেহের রক্তের সংস্পর্শে এলেই বিষক্রিয়া আরম্ভ হয় আর গরু মরে যায়। এ ছাড়া নরহত্যার ব্যাপারেও কঁচের বীচি ব্যবহৃত হয়। এই হিসাবে অপরাধ

বিজ্ঞানে কুঁচের বীচির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। নরদেহে কুঁচের বিষ যে জায়গায় প্রবেশ করানো হয়, সেখানে প্রথম ফুলে ওঠে। তারপর আরম্ভ হয় ব্যথা, সমস্ত দেহে প্রদাহ এবং ৩ থেকে ৪ দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটে থাকে।

নারীদেহের পক্ষে কুঁচের বীচি কখনই গ্রহণীয় নহে। এর সাধারণ বিষক্রিয়া ছাড়াও নারীদেহের যৌন চক্রের সাধারণ গতি-বিধির উপর এর বিশেষ ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। এছাড়া কুঁচের বীচি বিভিন্ন অপরাধের কাজে ব্যবহারের নজীর আছে।

খোসা ছাড়িয়ে কুঁচের বীচির নিষ্কাসিত রস বিশেষ রকম চোখ-ওঠার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। ঈজিপ্টের কোনও কোনও স্থানে কুঁচের বীচি সিদ্ধ করে খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষেও দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য হিসাবে কুঁচের বীচির কিছু কিছু ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের জন্য বীচি ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করে নিলে বিষক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়।

রাসায়নিক পরীক্ষায় কুঁচের বিভিন্ন অংশ থেকে বিভিন্ন যৌগিক পাওয়া গিয়েছে। শিকড় আর পাতায় গ্লিশিরিজিন নামক যৌগিক আছে। এর উপর শিকড় আর পাতার মিষ্টত্ব নির্ভর করে। এই যৌগিকটি যষ্টিমধুতে থাকে। সেজন্য কুঁচের আর এক নাম 'বন্য যষ্টি-মধু'। কুঁচের পাতাগুলি শিকড়ের চেয়ে বেশী মিষ্টি। পাতা আর শিকড়ের জলীয় নিষ্কাশন ব্যবহৃত হয় সর্দি কাশি প্রভৃতি রোগে।

কুঁচের বীচিতে বিভিন্ন রকমের যৌগিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। অ্যাব্রিন নামক একটি অ্যালবুমেন ঘটিত যৌগিক পদার্থ আছে। এর উপর কুঁচের বিষক্রিয়া নির্ভর করে। এই যৌগিককে বিশ্লেষণ করে 'গ্লোবিউলিন' আর 'অ্যালবুমেনোজ' নামে দুটি যৌগিক পদার্থ পাওয়া গেছে। এই দুটিরই বিষক্রিয়া আছে। ১০০° ডিগ্রি

সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায় অ্যাব্রিনের বিষক্রিয়া নষ্ট হয়। সেজন্য সিদ্ধ করে জোলাপ আর খাদ্য হিসাবে কুঁচের বীচি ব্যবহৃত হয়। ডাঃ ঘটক প্রমুখ ভারতীয় বিজ্ঞানীরা বীচি থেকে 'অ্যাব্রাইন' নামে উপক্ষার পৃথক করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রসায়নীদের প্রচেষ্টায় সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ দ্বারা এই যৌগিকের আণবিক গঠন স্থির হয়েছে। এছাড়া অ্যাব্রালিন নামে গ্লুকোজ সংলগ্ন যৌগিকও আলাদা করা হয়েছে। বীজ থেকে শতকরা ৬ ভাগ তেল এবং খোসার রঞ্জক দ্রব্য গ্লুকোজ সংলগ্ন অ্যান্থোসিয়ানিন জাতীয় যৌগিক পাওয়া যায়। এই দ্রব্য এবং বাজারে যে কুঁচের তেল বিক্রি হয়, তা এক নয়।

ডাঃ চোপরার অভিমত হচ্ছে যে, দেহের ওজনের প্রত্যেক এক কিলোগ্রাম ওজনের জন্য যদি ০.০০০৫-০.০০১ মিলিগ্রাম অ্যাব্রিন ইন্‌জেকসন দেওয়া হয় তবে বিষক্রিয়া বেশ ভালভাবে বোঝা যায়। গুঁড়া বীচিগুলির জলীয় নিষ্কাশন চোখের পক্ষে বিশেষ অপকারী, এমন কি এর ফলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। অ্যাব্রিনের বিষক্রিয়া মুখের ভিতর, গলা কিংবা পাকস্থলীতে দেখা যায় না। পাকস্থলীতে পরিপাক হওয়ায় এর বিষক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়। বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই যে, প্রাণীদেহে অল্প পরিমাণ আব্রিন ইনজেকসান দিয়ে অ্যাব্রিনের বিষক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মানো যায়।

বিভিন্ন রকম গুণাগুণের জন্য বনানীর বিশেষ সম্পদ হিসাবে কুঁচ সমাদর লাভ করেছিল। কৃষকবধূ আজ আর কুঁচের মালা ব্যবহার করে অঙ্গশোভা বর্ধন করে না। অ্যাব্রিন অচল হয়েছে, আর রতির ব্যবহার বিজ্ঞানসম্মত নয়। কিন্তু অপরাধ-বিজ্ঞানীদের কুঁচ সম্বন্ধে আগ্রহ বেশ রয়েছে। নতুন রকমের গবেষণার দ্বারা স্থির হতে পারে— কুঁচ আমাদের এক বিশেষ সম্পদ হয়ে থাকবে কিনা।

———

# খয়ের

কথিত আছে যে, খয়ের মঙ্গল ও কার্তিকের তুষ্টি সাধনে সক্ষম। এই রকম নানাধরণের কাহিনী খয়েরের ব্যবহারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ইংলণ্ডে খয়ের প্রচলনের ইতিহাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খয়েরের ইংরাজী নাম কাচ ( Cutch ) সম্ভবতঃ কানাড়ি ভাষা থেকে উদ্ভুত। এছাড়া ক্যাটাচু ( Catechu ) নামেও ইংরাজি ভাষায় খয়ের পরিচিত। এটাও দক্ষিণ ভারতীয় নাম থেকে উদ্ভুত। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, দক্ষিণ ভারত থেকেই বিদেশে খয়ের রপ্তানি হতো। ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে পার্সিয়া দে-অরতা নামক একজন পর্যটক খয়েরের গাছ এবং খয়ের তৈরীর পদ্ধতি বর্ণনা করেন। তিনি এই গাছকে কাটি নামে অভিহিত করেছিলেন। সপ্তদশ শতকের আগে এই বিবরণী ইংলণ্ডের লোকের নজরে বিশেষ আসে নি। তাই ইংলণ্ডে যখন প্রথম খয়ের পৌছতে লাগল তখন এটা খনিজ পদার্থ বলে লোকের ধারণা ছিল। মালটা সরাসরি ভারত থেকে ইংলণ্ডে না গিয়ে জাপান হয়ে ইংলণ্ডে পৌছত। এজন্য খয়ের ইংলণ্ডে 'টেরা জ্যাপোনিকা' নামে পরিচিত ছিল। ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্লেয়ারের বিবরণীতে পার্সিয়ার নিবন্ধের কথা উল্লেখিত হয়। সেই থেকে খয়েরের আসল স্বরূপ ইংলণ্ডে প্রকাশিত হলো। ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন ফারমাকোপিয়াতে খয়ের স্থান পেল। কিন্তু সরকারীভাবে ব্রিটিশ ফারমাকোপিয়াতে খয়ের স্থান পেল ১৮৬৪ সালে।

ভারতবর্ষে খয়ের তৈরী করা একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের পেশা। উত্তর ভারতে এই সম্প্রদায় 'খয়েরী' নামে পরিচিত এবং দক্ষিণ ভারতে

কোথাও কোথাও 'কথাকড়ি' নামে পরিচিত। 'কথাকড়ি' কথাটা এসেছে খয়েরের আর এক নাম 'কথ থ' থেকে।

দ্রব্যগুণবিদ্‌গণ খয়েরকে খদির পর্যায়ে ফেলেছেন। এটি শীত-বীর্য, দন্তের হিতকারক, তিক্ত কষায় বলে বর্ণিত হয়েছে। নানারকম দৈহিক উপসর্গে এটি কার্যকরী।



খয়ের গাছ

খয়ের গাছ সাধারণতঃ ৮ থেকে ১০ ফিট লম্বা হয় এবং ২ থেকে ৩ ফিট পর্যন্ত কাণ্ডের পরিধি হয়। এর ছাল কালচে ধূসর বাদামী রঙের এবং আধ ইঞ্চি পরিমাণ পুরু হয়।

ভারত ও ব্রহ্মদেশের শুষ্ক ও পাহাড়ী অঞ্চলে এই গাছ বেশ জন্মায়। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে গাছটি 'অ্যাকাসিয়া ক্যাটাচু উইল্ড' (Acacia catechu Willd) নামে পরিচিত। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় এটি

খদিরা, খয়ের, সান্দ্রা, কারাঙ্গালি, কাগগালি নামে পরিচিত। খয়ের মাইমোসি বংশের অন্তর্ভুক্ত।

খয়ের গাছের গুরুত্ব খয়ের বা কাচ ( Cutch ) তৈরীর জন্য। সাধারণতঃ ত্ব'রকমের খয়ের বাজারে বিক্রি হয়। প্রথম রকমের হচ্ছে কাথথা বা ফিকে রঙের খয়ের। আর এক রকমের খয়ের হচ্ছে বেশ গাঢ় রঙের। পানের সঙ্গে মশলা হিসাবে খয়ের ব্যবহার ছাড়াও বয়ন শিল্পে এর ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অনেক সময় পুরানো খয়ের গাছ থেকে খীরশাল নামক একরকম শাদা চকচকে দানাদার আকারের জিনিস পাওয়া যায়। এগুলির দর বেশ। কাশি ও গলার ঘাতে এর ব্যবহারের প্রচলন আছে।

খয়ের তৈরীর জন্য সাধারণতঃ ২৫ থেকে ৩০ বছরের গাছের সারি কাঠ বেছে নেওয়া হয়। এর পর সারি কাঠগুলি এক বর্গ ইঞ্চি আকারে কেটে নেওয়া হয়। ১২ ঘণ্টা ধরে সেগুলিকে সিদ্ধ করা হয়। এর পর গাঢ় নিষ্কাশন কাঠের ছাঁচে ঢেলে দেওয়া হয়। এতে বিভিন্ন আকারের খয়ের পাওয়া যায়। খয়ের নিষ্কাশনের জন্য লোহার কড়া ব্যবহার করা সমীচীন নয়। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, এতে খয়ের কালো বা সবজে হয়ে যেতে পারে। এজন্য কোথাও কোথাও মাটির কড়া ব্যবহার করা হয়। তবে আজকাল টিন দিয়ে মোড়া তামার কড়াই বেশী ব্যবহৃত হয়।

ভারতের খয়েরের কারখানাগুলির মধ্যে ইজ্জতনগরের উড প্রোডাক্টস কোম্পানীর উৎপাদন সবচেয়ে বেশী। বছরের প্রায় ৪০০ টন কথথা ও ৩০০ টন কাচ তৈরী হয় এখানে।

সিল্ক ও কার্পাসের সুতো রাঙাতে খয়ের ব্যবহৃত হয়। বিশেষ রকমের রঙিন ছাপার কাজে এবং কাগজ কিংবা কাগজের মণ্ড রাঙাতে খয়েরের প্রচলন আছে। খয়ের দিয়ে রাঙানো জাহাজের পাল সমুদ্রের লোনা জলের বিরুদ্ধে বেশী টেকসই।

খয়ের গাছের সারি কাঠের প্রধান উপাদান হচ্ছে ক্যাটাচিন এবং ক্যাটাচুনিক অ্যাসিড। এতে ক্যাটাচিনের পরিমাণ থাকে প্রায় ৪ থেকে ৭ শতাংশ, কিন্তু খয়েরে ক্যাটাচিনের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১৭ শতাংশ। পান খেলে খয়েরের জন্য যে রং হয় সেটা ক্যাটাচিন এবং চুনের সংমিশ্রণে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে। পুরানো পুঁথিপত্রে দন্ত হিতকারক বলে খয়ের উল্লেখিত হয়েছে, কিন্তু বেশী খয়ের ব্যবহারের ফলে দাঁত কালচে হয়ে যায়।

কাঠ হিসাবে খয়ের গাছ বেশ টেকসই। খয়েরের সারি কাঠ বেশ ভাল পালিশ নেয়। বিভিন্ন রকমের কাঠের ঘানির জন্য এই কাঠ ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া গরুর গাড়ির চাকার জন্য খয়ের কাঠ বেশ মজবুত বলে বিবেচিত হয়। তবে এই কাঠ সংগ্রহ করা বিশেষ দুরূহ। খয়ের গাছের উপর লাক্ষার চাষ চলতে পারে। তবে সেটা জুলাই মাসেই ভাল হয়। এই লাক্ষা গুণগত ভাবে পলাশ কিংবা কুলগাছের তৈরী মালের অনুরূপ। ভারতে খয়েরের আমদানি এবং রপ্তানি দুই-ই চলে।

---

# ঘৃতকুমারী

আদান উপসাগরে ছোট্ট একটা দ্বীপ সকোত্র। এখনকার নারীদের নিয়ে পুরাকালে কিম্বদন্তী প্রসার লাভ করেছিল সারা দক্ষিণ ইউরোপ, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে। শোনা যায়, মহিলাদের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল রোষ সৃষ্টি হলে তারা নাকি কোনও পুরুষের লিভার পর্যন্ত কেড়ে নিতে পারত। এর পিছনে ছিল সকোত্রের মসাব্বরের গুণাগুণ। আরবীয় ঐতিহাসিক ঈদৃশির বিবরণী থেকে জানা যায়, আলেকজাণ্ডার সকোত্র অভিযান করেছিলেন সেখানকার উৎকৃষ্ট ঘৃতকুমারীর জন্য। ঘৃতকুমারীর আর একটা প্রসিদ্ধ নাম মসাব্বর। মিঃ মেওয়াট উল্লেখ করেছেন, মসাব্বর কথাটা এসেছে লাটিন ভাষা থেকে। এর অর্থ হচ্ছে লিভার বা যকৃৎ। মসাব্বর আর সকোত্র কথার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ একই। আরবীয়গণের কাছে মসাব্বর ধৈর্যের প্রতীক হিসাবে সম্মান পেয়ে থাকে। আরবোপন্যাসে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, কবরের উপর মসাব্বর পুঁতে দেওয়া হতো। মসাব্বরের যখন ফুল ফুটবে তখন কবরের ভিতরের দেহ চলে যাবে আল্লার উদ্যানে।

ঘৃতকুমারী ভারতীয় গুল্ম কিনা এ সম্বন্ধে মতের গরমিল আছে। ডাওসকোরিডাসের বিবরণীতে পাওয়া যায় যে, ভারতবর্ষে নবম শতাব্দীতে প্রচুর পরিমাণে মসাব্বর পাওয়া যেত। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘৃতকুমারী এমন সব নামে পরিচিত যে, তার অর্থ দাঁড়ায় কুমারী দুর্গা। এই থেকে প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ রসায়নী ডাইমক উল্লেখ করেছেন যে, ঘৃতকুমারী ভারতীয় বনৌষধির সভ্য। হয়তো ভারতে ঘৃতকুমারীর চাষ হতো না, কিন্তু অর্ধবন্য কিংবা বন্য ভাবে জন্মাত।

ভেষজ হিসাবে ঘৃতকুমারীর ব্যবহারের কথা হিপোক্রেটাস কিংবা থিওপ্রেটাসোর গ্রন্থে পাওয়া যায় না, কিন্তু ডাওসকোরিডাসের ও প্লিনির গ্রন্থে এর ব্যবহারের কথা লিপিবদ্ধ আছে। নবম শতাব্দীর বিশিষ্ট চিকিৎসক আবু হানিফ মসাব্বরের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন। আবু হানিফ গাছটির মোটা পাতা, হলদে ফুল আর বেশ রস আছে বলে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া তিনি মসাব্বর তৈরীর প্রক্রিয়াও বর্ণনা



ঘৃতকুমারী গাছ

করেছেন। ডাইমক তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, মসাব্বর ভারতবর্ষে আরবীয়গণ কর্তৃক ভেষজ হিসাবে প্রবর্তিত হয়েছিল। এজন্য সংস্কৃত ভেষজ বিশারদগণ এর ব্যবহারের উল্লেখ বিশেষ করেন নি। তাঁর যুক্তি হচ্ছে, যেহেতু যবনেরা এই বনৌষধি প্রবর্তন করেছিলেন সেজন্য রক্ষণশীল ভেষজবিদ্‌গণের মসাব্বরের উপর বিরাগ ছিল। কিন্তু আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় অনেকদিন থেকেই ঘৃতকুমারী ব্যবহৃত হয়ে

আসছে বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়াতে, যেমন পারার শোধনে। এদিক থেকে বিচার করলে বিজ্ঞানী ডাইমকের যুক্তি এবং মতকে মেনে নেওয়া যায় না।

জোলাপ হিসাবে ঘৃতকুমারীর ব্যবহার আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। বিভিন্ন রকমের জ্বর হাঁপানি ও কুষ্ঠ ব্যাধির বিরুদ্ধে প্রয়োগেও ঘৃতকুমারী ফলপ্রদ।

ফুলের ব্যবহার হয় আমাশায় ও পিত্তাধিক্যে। গত শতাব্দীর ভারতীয় চিকিৎসকগণ কর্তৃক বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে ঘৃতকুমারীর ব্যবহারের কথা জানা যায়। ডাঃ এফ এইচ থ্রনটন উল্লেখ করেছেন যে, আয়রন সালফেট সহযোগে ঘৃতকুমারী বিশেষ রকম স্ত্রীরোগে ফলপ্রদ। এছাড়া মাথাধরা কিংবা কোষ্ঠবদ্ধতায় মসাব্বর ব্যবহার করে তিনি ফল পেয়েছেন। ব্যথা এবং বিভিন্ন ধরণের প্রদাহে ঘৃতকুমারীর ব্যবহারের কথা কলকাতার ডাঃ সোম উল্লেখ করেছেন।

ভারতীয় ঘৃতকুমারী লিলিয়াসি ( Liliaceae ) গোত্রের এবং অ্যালো ভেরা (Aloe vera) নামে পরিচিত। ছোট কাণ্ড সমেত গুল্মটি ছ ফিট পর্যন্ত উঁচু হয়, পাতাগুলি রসাল এবং বেশ পুরু। পাতার ধারগুলিতে কাঁটা থাকে। ভারতবর্ষে হিমালয় থেকে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত সর্বত্র অর্ধবন্য হিসাবে গাছটি জন্মে। তবে এর মধ্যে ২।৩টি প্রকার ভেদ আছে। আলো ভেরা ভার চাইনেনসিস ( বেকার ) দাক্ষিণাত্যের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। মাদ্রাজ উপকূলে পাওয়া যায় অ্যালো ভেরা ভার লিটোরালিস ( কায়েনিং এক্স বেকার )। এর পাতা-গুলি ছোট ছোট। এই রকম গাছগুলি রামেশ্বর পর্যন্ত দেখা যায়। আর এক রকমের ঘৃতকুমারী জাফরাবাদের অ্যালো নামে পরিচিত।

সাধারণতঃ পাতা কেটে আড়াআড়িভাবে রেখে দিলে কিছুক্ষণ পরে রস বেরিয়ে আসে। এই রস সংগ্রহ করে শুকিয়ে বেশ শক্ত করা

হয়। বাজারের মসাব্বর, ঘৃতকুমারী বা বিভিন্ন ফারমাকোপিয়ায় প্রচলিত অ্যালো হচ্ছে এই শুকনো জিনিস।

ঘৃতকুমারীর বসতি এবং অ্যালো তৈরীর পদ্ধতির উপর নির্ভর করে অ্যালোর গুণাগুণ। অ্যালোগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয় প্রস্তুত পদ্ধতির প্রকার ভেদ অনুযায়ী। প্রথম প্রকারের অ্যালো লিভারি অ্যালো নামে পরিচিত। এগুলির রস রোদে শুকিয়ে অল্প উত্তাপে তাতিয়ে নেওয়া হয়। এটি অস্বচ্ছ এবং স্ফটিকাকার নয়। একটু বেশী উত্তাপে তাতিয়ে শুকিয়ে ফেললে অ্যালোর চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়। জিনিসগুলি স্বচ্ছ হয়। এগুলিকে গ্লাশি অ্যালো বলা হয়।

ব্রিটিশ ফারমাকোপিয়াতে চার রকমের অ্যালোর মান প্রামাণিক হিসাবে গণ্য হয়—(১) কারকাও অ্যালো বা বারবাডোসের অ্যালো, এগুলির রং খয়েরি ; ( ২ ) সকোত্রের অ্যালো, হলদে কিংবা একটু কালো ; ( ৩ ) জাঞ্জিবার অ্যালো ; ( ৪ ) কেপ অ্যালো গাঢ় খয়েরি রঙের। প্রথম তিন প্রকার লিভারি অ্যালোর পর্যায়ভুক্ত এবং চতুর্থটি গ্লাশি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

খয়ের, লোহার ডেলা এবং পাথরের কুচি প্রায়ই ভেজাল হিসাবে অ্যালোর সঙ্গে মেশানো হয়। এগুলি সহজেই ধরা যায়। সুরাসার নিষ্কাশনে লোহার ডেলা বা পাথরের কুচি পড়ে থাকবে। অ্যালোর সুরাসার নিষ্কাশন অতিবেগুনী আলোর নিচে পরীক্ষা করলে খয়ের থেকে আলাদা ভাবে চেনা যায়। খয়েরের নিষ্কাশন অতিবেগুনী আলোতে কালো দেখা যায় আর অ্যালোর নিষ্কাশনের রং গাঢ় পিঙ্গল হয়।

অ্যালোর রাসায়নিক পরীক্ষা করে কতকগুলি গ্লুকোজ সংলগ্ন যৌগিক পাওয়া যায়, এগুলিকে বলা হয় অ্যালোয়ান। বারব্যালোয়ান, অ্যালো এমডিন ছাড়া অ্যালো থেকে খানিকটা রজন জাতীয় পদার্থ

পাওয়া গিয়েছে। মসাব্বরের যে গান্ধটা পাওয়া যায় সেটা এর গন্ধ তেলের জন্য। চোপরা ও ঘোষ অ্যালো ভেরা পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, এতে অ্যালোয়ান নেই, আছে খানিকটা রজন জাতীয় আর আঠা জাতীয় জিনিস। এ ছাড়া অ্যানথ্রাকুনোন গোষ্ঠীর যৌগিক এমডিন। জাফরাবাদের অ্যালোতে ১৩.৬% অ্যালোয়ান আছে।

ভারতীয় ফারমাকোপিয়ায় ( ১৯৫৫ ) জোলাপ হিসাবে অ্যালোর ব্যবহারের কথা লিপিবদ্ধ আছে। দু থেকে তিন গ্রেণ অ্যালো ৮ থেকে ১২ ঘণ্টার মধ্যে কার্যকরী হয়। অ্যালোর প্রভাবে তলপেটে কতগুলি উপসর্গ দেখা দেয় বলে জোলাপ হিসাবে এটা সকলের পক্ষে ব্যবহার করা উচিত নয়, বিশেষতঃ যাদের অন্ত্র প্রদাহ আছে। যে সব রমণী অন্তঃসত্ত্বা তাঁদের পক্ষে মসাব্বর ক্ষতিকর। ১০০ গ্র্যাম অ্যালো অল্প অল্প করে এক সের ফুটন্ত জলে বেশ ভাল করে ঘেঁটে মিশিয়ে নেওয়া হয়। তারপর এই মিশ্রণটা ২৪ ঘণ্টার জন্য রেখে রসটা উপর থেকে টেনে নিয়ে ৬০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপে শুকিয়ে ফেলা হয়। এর পর এটিকে বোতলে এমন ভাবে ভরা হয় যাতে একটুকু জলও না থাকে। ৬০ থেকে ২৫০ মিলিগ্রাম অ্যালো একবারে গ্রহণীয়।

অ্যালোর কারবার ভারতবর্ষ, উত্তর আফ্রিকা, আরব, দক্ষিণ ইউরোপে চলত অনেক দিন থেকেই। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতে অ্যালোর আমদানি ও রপ্তানির কারবার চলত। আজকাল রপ্তানি বন্ধ হয়ে গেছে আর আমদানির কারবারও মন্থর হয়ে প্রায় নিশ্চল হয়ে এসেছে।

---

# চীনাবাদাম

চীনাবাদাম ভারতবর্ষে প্রবর্তিত হয়েছে ষোড়শ শতাব্দীতে। চীনাবাদামের আদি বসতি ব্রাজিলে, কিন্তু সম্ভবতঃ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি হয়েছিল। এজন্য বিভিন্ন অঞ্চলে এটি বিভিন্ন নামে পরিচিত। বাংলাদেশে এই বাদাম চীনাবাদাম নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ বাংলাদেশে এই বাদাম আমদানি হয়েছিল চীন থেকে। ম্যানিলা থেকে দক্ষিণ ভারতে এসেছে। এজন্য সেখানে এটি ম্যানিলা কোটাই নামে পরিচিত। ভারতে চীনাবাদামের বিবরণ প্রথম পাওয়া যায় বুকানন হ্যামিলটনের বিবরণী থেকে। ব্রাজিল থেকে আমদানি হওয়ার পূর্বে সমস্ত পূর্ব গোলার্ধে চীনাবাদাম অজানা ছিল। ভারতে চীনাবাদামের চাষ গত শতক থেকে আরম্ভ হয়েছে। আজকাল এই চাষ বেড়ে চলছে। পৃথিবীর উৎপাদনের প্রায় শতকরা ত্রিশ ভাগ ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়। দেশ বিদেশে চীনাবাদামের রপ্তানিতে ভারতবর্ষের আয় হয় প্রচুর।

উদ্ভিদ বিজ্ঞানে চীনাবাদামের গাছ অ্যারাচিস হাইপোগিয়া লিন্ (Arachis Hypogea Linn) নামে পরিচিত। গাছটি প্যাপিলনেসি বংশের অন্তর্ভুক্ত।

সাধারণতঃ দু'রকমের চীনাবাদাম গাছের চাষ হয়। প্রথম ধরণের হচ্ছে 'লতান' ( runner type )। অপরটি হচ্ছে 'গুচ্ছ' ধরণের ( bunch type )। গুচ্ছ ধরণের গাছগুলি কম জায়গা নিয়ে জন্মায়। ৩ থেকে ৪ মাসের মধ্যে এগুলির ফলন হয়। এর শাখাগুলি বেশ সোজা হয় আর ফলগুলি শিকড়ের সঙ্গে লেগে থাকে। এর ফলগুলি একটু

ছোট আকারের আর খোসাটা অনেক পাতলা হয়। 'লতান' ধরণের গাছ অনেকটা জায়গা জুড়ে হয় এবং এর ফসলগুলিও হয় অনেকটা জায়গা জুড়ে। এই ধরণের গাছের ফসল হতে চার থেকে ছয় মাস লাগে। এই গাছের ফলের খোসা হয় বেশ মোটা।

বিভিন্ন রকমের মাটি চীনাবাদামের চাষের উপযুক্ত। বালিমাটি, কাদামাটি কিংবা দোআঁশ মাটিতে এই গাছের চাষ হয়। মাটিতে চূণের পরিমাণ কম থাকলে দানাগুলি বড় হয় না। বেশী বর্ষায় গাছের বৃদ্ধি হয় বেশী, কিন্তু ফল হতে দেরি লাগে এবং ফসলও হয় অনেক কম। যে সব জায়গায় ৫ থেকে ৫০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয় সে সব অঞ্চলে চীনাবাদাম ভাল জন্মায়।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের চীনাবাদামের চাষ হয়। মাদ্রাজের কৃষি বিভাগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় পঞ্চাশ রকমের চীনা-বাদাম সংগ্রহ করা হয়েছে। ভারতে সাধারণতঃ চার রকম জাতের দানা পাওয়া যায়। এর মধ্যে 'করো মণ্ডল' এবং 'বোল্ড' জাতের দানা লতান ধরণের গাছ থেকে পাওয়া যায়। আর 'পী-নাট' এবং 'রেড নেটাল' জাতের দানা হয় গুচ্ছ ধরণের গাছ থেকে। এছাড়া বোম্বাইতে আরও দু'রকমের চীনাবাদাম পাওয়া যায়। সেগুলি হচ্ছে করাদ এবং ভার্জিনিয়া জাতের। বোল্ড জাতের চীনাবাদামগুলি বেশ বড়। এর ৫০টা শাঁসের ওজন প্রায় এক আউন্স হয়। করো মণ্ডল জাতের দানা এ থেকে একটু ছোট। পী-নাটগুলি ছোট এবং গোল আকারের হয়ে থাকে। এগুলির কমপক্ষে ৭৭টি মিলে এক আউন্সের মত ওজন হয়। রেড নেটাল জাতের ফলের খোসাটা গাঢ় লাল হয় আর তার তেল হয় রঙিন।

চীনাবাদামের গুণাগুণের বিচারে কয়েকটি বিষয়ের উপর নজর দেওয়া হয়।

(১) শাঁসের তেলের পরিমাণ।

(২) গোটা ফলে খোলার ওজন।

(৩) চীনাবাদামের রং এবং চীনাবাদামের দানার আকার।

সকল রকম বাদামের মধ্যে বাজারে তেলের জন্য খান্দেশ অঞ্চলের মালেরই সবচেয়ে বেশী কদর। খান্দেশ অঞ্চলে বেশীর ভাগই 'পী-নাট' জাতের চীনাবাদাম উৎপন্ন হয়। মাদ্রাজে পী-নাট থেকে করো মণ্ডল



গুচ্ছ জাতীয় চীনাবাদাম গাছ

জাতের চাহিদা বেশী, কারণ পী-নাট থেকে যে তেল পাওয়া যায় তাতে যথেষ্ট পরিমাণ তলানি পড়ে। শাঁসের তেলের পরিমাণ নির্ভর করে ফসল সংগ্রহের উপর।

সাধারণতঃ ফল বেশ ভাল করে পাকবার এক সপ্তাহ আগে ফসল সংগ্রহ করলে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ তেল পাওয়া যায়। কিন্তু এর একটু

ব্যতিক্রম হলেই তেলের পরিমাণ কমে আসে। তেলের গুণাগুণের বিচারে আর একটা বিষয়ের উপর নজর দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে তেলে কি পরিমাণ চর্বি জাতীয় অ্যাসিড থাকে। ভাল শাঁসে ০·১%-০·২% এর বেশী অ্যাসিড থাকে না। বেশী পরিমাণ অ্যাসিড থাকলে দালদা কিংবা মার্গারিন জাতীয় জমানো তেল তৈরী করা সম্ভব নয়।

শাঁস বেশী পাওয়া যায় গুচ্ছ জাতীয় গাছের ফল থেকে (৮০%)। কিন্তু লতান জাতের গাছ থেকে ফলের ৬০-৭৫% শাঁস পাওয়া যায়, কারণ এর খোসাগুলি বেশ মোটা ধরণের। যে সব চীনাবাদাম খাবার জন্য ব্যবহৃত হয় সেগুলির আকার আর রং প্রয়োজনীয় সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হয়। এ হিসাবে বোল্ড এবং ভার্জিনিয়ার যথেষ্ট সমাদর আছে।

ভারতে চীনাবাদামের চাষ হয় মৌসুমী ফসল হিসাবে। কোথাও কোথাও সেচভূমিতে চীনাবাদামের চাষ হয়। সে সব জায়গায় ফেব্রুয়ারী মার্চে বীজ বোনা হয় এবং জুন জুলাই মাসে ফসল তোলা হয়। মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ এবং হায়দ্রাবাদ অঞ্চলে জুন থেকে আগষ্ট হচ্ছে বোনার সময় আর সেপ্টেম্বর থেকে জানুয়ারী হচ্ছে ফসল তোলবার সময়।

যদিও চীনাবাদামের জন্য পর্যায় ক্রমের (ক্রপ রোটেশন) চাষ নিষ্প্রয়োজন, মাদ্রাজের অনেক জায়গায় ধান কিংবা তুলার সঙ্গে পাল্টা পাল্টি ভাবে চীনাবাদাম চাষ করা হয়। অনেক জায়গায় চীনাবাদাম উঠে যাওয়ার পর ভুট্টা, তিল ইত্যাদি ফসল বোনা হয়। চীনাবাদাম প্যাপিলনেসি বংশের গাছ বলে এর চাষের পর মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এজন্য সে ক্ষেতে পরবর্তী ফসলগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। সেচভূমিতে চীনাবাদামের সঙ্গে অন্যান্য ফসল মিশিয়ে বোনা হয়। এর মধ্যে চীনাবাদাম এবং ক্যাস্টর কিংবা চীনাবাদাম এবং অড়হর সবচেয়ে ভাল সংমিশ্রণ।

গুচ্ছ জাতীয় চীনাবাদামের একশ' পাউণ্ড বীজ প্রয়োজন হয় এক একর জমিতে বুনতে। আর লতান জাতের দরকার হয় ৭৫-৮৫ পাউণ্ড। সেচভূমিতে শতকরা ২০ ভাগ কম লাগে। মৌসুমী বর্ষার অব্যবহিত পরেই জমিতে লাঙল দিয়ে চাষ করে জমি তৈরী করা হয়। কালো মাটির দেশে ( ব্ল্যাক সায়েল ) কিন্তু অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। সেখানে মাটি খুঁড়ে বীজ বোনা হয়। বোনার তিন সপ্তাহ পরে যখন প্রথম ফুল ফোটে তখন একবার, আরও একমাস পরে আর একবার নিড়ান হয় আগাছা পরিষ্কার করবার জন্য।

গবাদি পশুর সার ব্যবহার করা হয় জমিতে। বালি মাটিতে এক একর জমিতে প্রায় ১৫-২০ টন পুকুরের কিংবা খালের পাক মিশিয়ে দেওয়া হয়। পর্যায় চাষের ক্ষেত্রে চীনাবাদামের আগের ফসলের জন্য সার ব্যবহার করে চীনাবাদামের ফসল প্রভাবিত করা হয়। বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের কালো মাটিতে নাইট্রোজেনযুক্ত সার প্রয়োগে কোনও রূপ সুফল দেখা যায় নি। আকোলা গবেষণা কেন্দ্রে দেখা গেছে, পটাসিয়াম সালফেট ব্যবহার করলে চীনাবাদামের উৎপাদন হয় বেশী। ত্রিবান্দ্রম কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের পরীক্ষা থেকে জানা যায় যে, পটাস এবং ফসফরিক অ্যাসিড মিশ্রিত সারের ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়।

ফল যখন পাকতে থাকে তখন পাতাগুলি শুকিয়ে হলদে হতে থাকে। গুচ্ছ জাতের মালের বেশীর ভাগ ফসলই টেনে তোলা হয়। শুকনো এবং শক্ত মাটি থেকে পাচনের সাহায্যে ফসল তোলা হয়। লতান জাতের মাল ক্ষেত থেকে সংগৃহীত হয় লাঙলের সাহায্যে। সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গেই ফসল শুকিয়ে ফেলা হয়, কারণ ভিজে মালে তৈল জাতীয় অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

চাষীরা খোলাশুদ্ধ মাল বেচে। মিলে কিংবা রপ্তানির আগে খোলা ছাড়ান হয়। খোলা ছাড়ালে পরিবহনের সুবিধা হয় এবং সঙ্গে

সঙ্গে চালানি খরচও খানিকটা বেঁচে যায়। কিন্তু এতে পতঙ্গ এবং ছত্রাকের আক্রমণের যথেষ্ট ভয় থাকে। খোলা ছাড়ানোর বিভিন্ন রকম পদ্ধতি আছে। হাতে ছাড়ানোর পদ্ধতিতে খোলাশুদ্ধ মাল লাঠি দিয়ে ফাটিয়ে পরে কুলোয় খোলাগুলি আলাদা করা হয়।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় চীনাবাদামের ফসলের যথেষ্ট তারতম্য আছে। লতান জাতের মালের ফসল গুচ্ছ জাতের মালের চেয়ে অনেক বেশী। ভারতে এক একর জমিতে ৫০০ থেকে প্রায় ১০০০ পাউণ্ড মাল উৎপন্ন হয়। ভারতের ফসল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ। কিন্তু চীন দেশের ফলনের তুলনায় অনেক কম। সেখানে এক একরে প্রায় ১৬৩০ পাউণ্ড মাল উৎপন্ন হয়। ভারতে কোনও কোনও গবেষণা কেন্দ্রে চীনাবাদামের ফলন একর প্রতি ৩৩২৮ পাউণ্ড পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে।

চীনাবাদাম অনেক রকম পতঙ্গ ও ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়। এর মধ্যে Amsacta Albistriga নামক লাল পতঙ্গ মাদ্রাজে বিশেষ ক্ষতি করে। পতঙ্গগুলি পাতা খেয়ে ফেলে। এমন কি সময় সময় গোটা ক্ষেতটাই প্রায় শূন্য করে তোলে। সাধারণতঃ মাটির ভিতর দিয়ে এই পতঙ্গগুলি চলাফেরা করে, তাই আক্রান্ত জমির চারিদিকে খাল কেটে অন্যান্য জমিগুলিকে বাঁচানো হয়। যে সমস্ত জমিতে বৃষ্টি হয় অপরিমিত কিংবা অনিয়মিত যে সব জায়গায় Stomopteryx Neteria জাতের পতঙ্গের আক্রমণের প্রকোপ দেখা যায়। এগুলি বেশ শুকনো আবহাওয়ায় বাড়ে। এদের বিরুদ্ধে খুব জোরাল আলো ব্যবহার করে পতঙ্গগুলি ধরে মারা হয়। Sphenoptera Perotetti জাতীয় লার্ভার প্রসবে মৃত্তিকা সংলগ্ন কাণ্ড আক্রান্ত হয়। যে সব গাছ আক্রান্ত হয় সেগুলি সরিয়ে দিয়ে ক্ষেতের ফসল বাঁচানো হয়। এই জাতীয় লার্ভার প্রকোপ সাধারণতঃ সেচভূমিতেই হয়। বোম্বাইতে আর এক

রকমের রোগ দেখা যায় চীনাবাদামের শাঁসে। Aphanus Sordidus নামক কীট এই রোগ সৃষ্টি করে এবং শাঁস থেকে যথেষ্ট তেল বের করে নেয়। এ ছাড়া cercospora জাতীয় ছত্রাকের আক্রমণে এক রকমের রোগ দেখা যায়। এই রোগে পাতাগুলি হলদে হতে থাকে। বোর্ডো মিকশ্চার ব্যবহার করে এই ছত্রাক থেকে চীনাবাদাম গাছগুলিকে রক্ষা করা সম্ভব। এ ছাড়া চীনাবাদাম পাকবার সময় কাক এবং বন্য শূকরের উৎপাতে ফসলের যথেষ্ট ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। এ সত্ত্বেও ভারতবর্ষে চীনাবাদামের চাষ প্রচুর ফলপ্রদ।

সস্তা প্রোটিন জাতীয় খাদ্য হিসাবে চীনাবাদামের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এতে ভিটামিন বি-১, বি-২, বি-৬ এবং নিকোটেনিক অ্যাসিড আছে। লাল খোসাতে ভিটামিন বি-১ বেশী থাকে। চীনাবাদামে ভিটামিন-এ বেশ কম থাকে এবং ভিটামিন-সি থাকে না বললেই চলে। চীনাবাদামে লেসিথিন থাকে ০·৫-০·৭%। চীনা-বাদাম কাঁচা বা ভাজা খাওয়া চলে। এছাড়া লবণ দিয়ে বা মিষ্টি দিয়েও চীনাবাদাম খাওয়া যায়। আমেরিকাতে চীনাবাদামের 'পীনাট-বাটার' বেশ আদরণীয় খাদ্যবস্তু। খোলা ছাড়িয়ে গুঁড়ো স্পেনীয় বা ভার্জিনিয়ার চীনাবাদাম এক সঙ্গে মিশিয়ে পীনাট বাটার তৈরী হয়। স্যাণ্ডুইচ এবং বিস্কুটের কারখানায় বিভিন্ন রকমের মাল তৈরী করার জন্য পীনাট বাটারের বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে। পীনাটের ময়দা তুলো বীজের কিংবা সয়াবিনের ময়দার সঙ্গে মিশিয়ে ময়দার ন্যায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

চীনাবাদামের ৯% হজম করা সম্ভব। ক্যালরির মান থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, ১০০ গ্রাম চীনাবাদাম ৫৪৯ ক্যালরি শক্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম। চীনাবাদামের প্রোটিন তুলো বীজের প্রোটিন কিংবা সয়াবিন প্রোটিনের সমতুল্য। চীনাবাদামের প্রোটিনের উপাদান হচ্ছে

অ্যারাচিন এবং কেন্যারিচিন। তৈলবিহীন চীনাবাদামের ২৫ শতাংশ অ্যারাচিন এবং ৪ শতাংশ কেন্যারাচিন।

এই ছুটি গ্লেবিউলিন জাতীয় প্রোটিন। এই প্রেটিনদ্বয়ের অ্যামিনো অ্যাসিড বিশ্লেষণ করে যে ফল পাওয়া গিয়েছে তাতে মনে হয়, চীনাবাদামের প্রোটিনের সঙ্গে দুধের প্রোটিনের অনেকটা মিল আছে।

খাদ্য ছাড়া চীনাবাদামের প্রোটিন থেকে 'অ্যারড্রিল' নামক রেয়নের মত একরকম কৃত্রিম স্থতো প্রস্তুত করা সম্ভব। এই স্থতো দিয়ে উলের মত অনেক জিনিস তৈরী হতে পারে। এছাড়া প্লাইউড শিল্পে গ্ল্ তৈরীর জন্য চীনাবাদামের প্রোটিন ব্যবহৃত হয়।

ভারতে বাদাম তেলের জন্যই চীনাবাদামের বেশী ব্যবহার। সাধারণতঃ গরুর ঘানি ব্যবহার করে এবং রোটারি মিলের সাহায্যে তৈল বীজ নিষ্পেষণে তেল প্রস্তুত করা হয়। ঘানিতে তৈল বীজ ঠাণ্ডা অবস্থায় পেষাই করা হয় বলে এতে মিউসিলেজ এবং অ্যালবুমেন থাকে না বললেই চলে। খাবার তেল হিসাবে ঘানির তেলেরই কদর বেশী। ভারতের উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ তেল ঘানিতে প্রস্তুত হয়। এই পদ্ধতিতে তেলের ভিটামিন কম নষ্ট হয় এবং এর জন্য চীনাবাদামের শাঁসের চালানী খরচ বাঁচানো সম্ভব। রোটারি মিল থেকে ৩৬-৪২% তেল পাওয়া যায় আর এক্সপেলার ব্যবহার করলে ৪০-৪৪% তেল পাওয়া যায়। ভারতীয় তেল উৎপাদনের শতকরা ৭০ ভাগ বোম্বাই এবং মাদ্রাজেই হয়ে থাকে।

ভাল রঙের তেল পাওয়ার জন্য শাঁসের খোসা ছাড়িয়ে ঠাণ্ডা অবস্থায় হাইড্রলিক প্রেসে পেষাই করা হয়। এর পর যে চীনাবাদামের খৈল পাওয়া যায় সেটাকে আবার জল দিয়ে গরম করে পেষাই করা হয়। পেষাই-এর পর তেল ছেকে বড় বড় চৌবাচ্চাতে রেখে দেওয়া হয়। এখানে গুঁড়োগুলি তলানি পড়ে যায়। ঠাণ্ডা পেষাই তেলের

রং হয় সোনালী হলদে, আর এতে মনোরম সুগন্ধ থাকে। অনেক সময় সেটা গাঢ় লালচে বা বাদামী রঙের হয়ে থাকে। ভারতে আজকাল চীনাবাদামের তেলের অনেকটা ব্যবহৃত হয় বনস্পতি উৎপাদনের জন্য। আমেরিকা বা ইংলণ্ডে ঠাণ্ডা ভাঙানো তেল খাবার বা মার্গারিন তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হয়।

ওষুধপত্রে যে বাদাম তেল ব্যবহৃত হয় সেটা ঠাণ্ডা ভাঙানো এবং তার গুণাগুণ ব্রিটিশ ফারমাকোপিয়াতে উল্লেখিত আছে। যেসব ক্ষেত্রে অলিভ ওয়েল পাওয়া দুষ্কর সেখানে মলম ইত্যাদি তৈরীর জন্য বাদাম তেল ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া ফারমাকোপিয়ার পরিশিষ্টে এই তৈল বিশুদ্ধ করে ভিটামিন-'এ' এবং 'ডি' এর সলিউশন করার জন্য বিধান দেওয়া হয়েছে। সাধারণতঃ ১৫০° ডিগ্রী উষ্ণতায় এক ঘণ্টা গরম করে এই তেল বিশুদ্ধ করা হয়। বাদাম তেল পশুর জোলাপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আজকাল ছত্রাক এবং পতঙ্গনাশক দ্রবণের জন্য বাদাম তেল ব্যবহৃত হচ্ছে।

অন্যান্য রকম সস্তা তেলের সঙ্গে মিশিয়ে নিচু স্তরের বাদাম তেল সাবান তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হয়। এছাড়া সুগন্ধ দ্রব্যের শিল্পে এবং চর্ম শিল্পে বাদাম তেল ব্যবহৃত হয়। ডিজেল তেলের পরিবর্তেও বাদাম তেলের ব্যবহার হতে পারে। যদিও তাপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই তেল ডিজেল তেলের সমকক্ষ, কিন্তু এতে যন্ত্রে কালি জমা হয় এবং যন্ত্রের ক্ষতি হয়।

পশুখাদ্য হিসাবে চীনাবাদামের খৈল বিশেষ মূল্যবান। খানিকটা গুড় এবং শ্বেতসার মিশিয়ে গবাদি পশুর আহার্য হিসাবে এটি ইউরোপে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। আমেরিকায় এটি শূকরের খাদ্য হিসাবে বিশেষ আদরণীয়। শুধু শাঁস খাওয়ালে শূকরের মাংস নরম হয়ে পড়ে, কিন্তু খৈল খাওয়ালে তা হয় না। মুরগীরা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে

চীনাবাদামের খৈল খাওয়ালে। ধান, আম, কফি এবং চায়ের ক্ষেতে চীনাবাদামের খৈল সার হিসাবে সমাদৃত হয়। নিকৃষ্ট শ্রেণীর কার্ড বোর্ড তৈরীর জন্য কিংবা গুঁড়া কর্কের সঙ্গে ভেজাল হিসাবে চীনাবাদামের খোসা ব্যবহৃত হয়। পী-নাট মাখমে ব্যবহৃত হয়।

ভারতীয় তৈল বীজের কারবারে চীনাবাদাম অন্যতম স্থান অধিকার করে আছে।

চীনাবাদামের রপ্তানির ব্যবসার খতিয়ান করলে দেখা যাবে যে, এই শতাব্দীর প্রথম থেকে আরম্ভ হয়েছে রপ্তানির সাধারণ বাজারের মন্দাগতি। আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ থেকে অত্যধিক মালের আমদানি, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বাজার দরের নিম্নগতির অন্যতম কারণ। মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে চীনাবাদামের দর বাড়তে থাকে। ১৯৪৬ সালে যখন ভারত সরকার মাল চালান নিয়ন্ত্রিত করে তখন দর ৩৮ পাউণ্ডে পৌঁছেছিল।

উৎপাদন হিসাবে মাদ্রাজ, বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ এবং মহীশূর ভারতের উদ্‌বৃত্ত এলাকা। এসব রাজ্য থেকে বাংলা, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে মাল চালান হয়ে থাকে। স্থলপথে বাণিজ্য একমাত্র হায়দ্রাবাদ, বোম্বাইতেই সীমাবদ্ধ। রেলে মাদ্রাজ থেকে মাল চালান সবচেয়ে বেশী হয়।

ভারতের বাজারদর যদিও লণ্ডনের বাজারদরের উপর নির্ভরশীল, মাদ্রাজ ও বোম্বাইএর বাজারদর থেকেই বাজারের অবস্থা বুঝা যায়। বোম্বাই-এর বাজার নির্ভর করে তেলকলের চাহিদার ও আগাম কেনা-বেচার অবস্থার উপর। বাজারদর পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, যখন মাঠ থেকে ফসল সংগ্রহ হয় তখনই থাকে বাজারদর সবচেয়ে কম। প্রায় মাস তিনেক দর মন্দা অবস্থায় থাকে।

চাষীদের কাছে যখন মাল থাকে তখনই দরটা কম থাকে। চাষীরা প্রয়োজনের জন্য মাল তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তারপরেই বাজার দর উঠতে থাকে। মোট কথা বাজারের ওঠা-নামার তারতম্যের জন্য চাষীদের বিশেষ সুবিধা হয় না।

লণ্ডন বাজারের দর অনুপাতে পৃথিবীর চীনাবাদামের দর ওঠা-নামা করে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ১৯২৬-২৭ সালে চীনাবাদামের (করোমণ্ডল) দর ছিল প্রতি টন ২০-২৭ পাউণ্ড। সেটা কমে ৩৪ সালের এপ্রিলে ৮ পাউণ্ডে দাঁড়ায়।

গত তিন দশকের মাঝামাঝি বাজার দর সবচেয়ে বেশীতে দাঁড়ায়। ভারতীয় রপ্তানি বাজার ভীষণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল গত যুদ্ধের ফলে। রপ্তানির শতকরা ৭৫ ভাগ মাল যেত ইউরোপে। এর মধ্যে ফ্রান্স ও নেদারল্যাণ্ড ছিল ভারতের মালের সবচেয়ে বড় গ্রাহক। যুদ্ধ এবং ফরাসী উপনিবেশে অত্যধিক চীনাবাদামের উৎপাদনের জন্য ফরাসী দেশের বাজার চলে গেল।

ভারতের রপ্তানির বেশীর ভাগ মালই খোলা ছাড়িয়ে জাহাজ বোঝাই হয়। মাদ্রাজ অঞ্চল থেকে করোমণ্ডল জাতের মাল চালান হয়। কথিয়াবাড় বন্দর থেকে খোলাশুদ্ধ মাল চালান হয়। এগুলি বোল্ড জাতের। এগুলির চেহারা গোল, চকচকে আর মসৃণ। চালানী খরচ বেশী পড়লেও এ মালে বেশ পয়সা আসে। বোম্বাই থেকে পী-নাট জাতীয় চীনাবাদাম রপ্তানি হয়। মাদ্রাজ থেকেই বেশী মাল বাইরে চালান যায়।

বাদাম তেলের রপ্তানি সবচেয়ে বেশী হয় ব্রহ্মদেশে। রপ্তানির প্রায় অর্ধেক মাল যায় ব্রহ্মদেশে। এছাড়া ষ্ট্রেট-সেটেলমেণ্ট, সিংহল এবং যুক্তরাজ্যে বাদাম তেল রপ্তানি হয়।

দেশে খাদ্য তেল এবং বনস্পতি উৎপাদনের জন্য বাদাম তেলের

প্রচুর চাহিদা আছে। যেসব তেল খাদ্যে ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে বাদাম তেলই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী। হায়দ্রাবাদ ও বোম্বাই থেকে বাদাম তেল উত্তর প্রদেশ, দিল্লী এবং বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে আমদানি হয়।

চীনাবাদামের খৈলের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। বাইরে যুক্তরাজ্যই এর বড় গ্রাহক। বর্তমানে রপ্তানির বাজার ক্রমে ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছে।

---

# ছাতিম

ছাতিম গাছ সংস্কৃত ভাষায় সপ্তপর্ণ নামে পরিচিত। কথাটা বোধ হয় ছাতিমের পল্লবে এক সঙ্গে সাতটি পাতা থাকে বলে প্রচলিত হয়েছে। ছাতিমের ছাল দিতা ছাল নামেও পরিচিত। গত শতাব্দীতে দিতার ব্যবহার হয়েছে কুইনাইনের পরিবর্তে ম্যালেরিয়া জ্বরে।



ছাতিম গাছ

আয়ুর্বেদে সপ্তপর্ণ ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে, আমাশয় ও পেটের অসুখে ব্যবহৃত হয় বলে নজীর আছে।

ভারতের সর্বত্রই প্রায় ৩০০০ হাজার ফিট উঁচু পর্যন্ত এই গাছ পাওয়া যায়, তবে আর্দ্র অঞ্চলে এই গাছ বেশী জন্মায়। ভারতের

পশ্চিম উপকূলেই গাছগুলি বেশী দেখা যায়। শোভা বর্ধন করার জন্য বাগানে ছাতিম গাছের চাষ করা হয়। ভারতবর্ষ ছাড়া ব্রহ্মদেশ, সিংহল, মালয় এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেও এই গাছ জন্মায়।

ছাতিম গাছ বেশ বড় হয় এবং চিরহরিৎ। গাছের ছালের রং ধূসর এবং অমসৃণ শাখাগুলি এক সঙ্গে কয়েকটি করে বেরিয়ে আসে। একটি পল্লবে তিন থেকে সাতটি করে পাতা থাকে। ছাতিম হিন্দীতে ছাতিয়ান, তামিল ভাষায় ভাদিরাশি, এবং তেলেগুতে এডাকুলাপুনা নামে পরিচিত। ছাতিম অ্যাপোসানাসি ( Apocynaceae ) গোত্রের অন্তর্ভুক্ত; এটি অ্যালষ্টোনিয়া স্কলারিশ আর, বি আর ( Alstonia scholaris R. Br. ) নামে পরিচিত।

ছাতিমের কাঠ কাটলে প্রথমে হলদে রং দেখা যায়। পরে আস্তে আস্তে রংটা লালচে হতে থাকে। কাঠ বেশ পাতলা এবং মসৃণ কিন্তু স্বাদে তেতো। ছাতিম কাঠ ভাল পালিশ নেয় এবং নরম প্লাইউড শিল্পে ব্যবহারের জন্যই এর এত কদর। ছাতিমের ফল থেকে রবার এবং রজন জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়।

ভারতীয় ছাতিমের ছালে শতকরা ০.১৬ থেকে ০.২৭ অংশ উপক্ষার থাকে। এর মধ্যে ০.০৮ থেকে ০.১০ শতাংশ হচ্ছে এচিট্যামিন, এটি হাইড্রোক্লোরাইড হিসাবে পৃথক করা হয়। উপক্ষার ছাড়াও নাইট্রোজেনবিহীন যৌগিকের মধ্যে দুটি ল্যাকটোন এবং ষ্টেরল অন্যতম। ভারতের নানাস্থানে এচিট্যামিনের রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধে গবেষণা চলেছে। প্রমাণিত হয়েছে যে, এচিট্যামিনে ( ছাতিমের তিক্ত যৌগিকটি ) ইণ্ডোলিন সংস্থা আছে।

কুইনাইন বা এমিটিনের মত ছাতিমের উপক্ষারের অ্যামিবার উপর কোনও ক্রিয়া নেই। বেকন এর কারণ দেখিয়েছেন যে, এচিট্যামিন প্রোটোপ্লাজমের উপর বিষক্রিয়াশূন্য। এচিট্যামিন পাখির ম্যালেরিয়াতে

মৃদুভাবে কার্যকরী। বিভিন্ন ভারতীয় গবেষক দেখিয়েছেন যে, এচিট্যামিন ম্যালেরিয়াতে কার্যকরী নয়। ইঁদুরের দেহে এচিট্যামিনের বিষক্রিয়া দেখা যায়। ইঁদুরের প্রতি ২০ গ্রাম ওজনের জন্য ০.৩-০.৫ মিলিগ্রাম এচিট্যামিন ফলপ্রদ। বিড়াল, বাঁদর এবং কুকুরের উপর পরীক্ষা করে মুখার্জী প্রমুখ বিজ্ঞানী দেখিয়েছেন যে, এচিট্যামিনের প্রভাবে রক্তচাপের সাময়িক হ্রাস হয়, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার সেটা বেড়ে যায়। রক্তের শর্করা জাতীয় পদার্থ কমাতে পারে এমন একটি যৌগিকও ছাতিম গাছে আছে। ভারতীয় ফারমাসিউটিক্যাল কোডেক্সে (১৯৫৩) ডাঃ বি, মুখার্জি ছাতিম গাছের ছালের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন। ম্যালেরিয়া এবং পুরানো পেটের অসুখে এই ছালের নিষ্কাশন বিশেষ ফলপ্রদ বলে বর্ণিত হয়েছে। ছাতিমের নিষ্কাশনের প্রভাবে শরীরের তাপ কমে এবং রোগীর কোনও রকম অবসাদের লক্ষণ দেখা যায় না। ইপিকার সংমিশ্রণে ছাতিমের নিষ্কাশন পেটের অসুখে বিশেষ ফলপ্রদ। এছাড়া চর্মরোগে এর ব্যবহারের কথা ডাঃ মুখার্জি উল্লেখ করেছেন। ১২৫ গ্রাম ছালের গুঁড়া আর এক লিটার ৬০% সুরাসার ভালভাবে মিশিয়ে টিনচার অ্যালস্টোনিয়া তৈরী হয়। এই টিনচারে শতকরা ৫২.৫% সুরাসার থাকবে। ৩০ থেকে ৬০ ফোঁটা টিনচার একবারে সেব্য।

# নিম

সমুদ্র মন্থন করে যে অমৃত সিঞ্চিত হয়েছিল তারই কয়েক ফোঁটা নাকি নিম গাছের উপর পড়েছিল। তাই অমৃতসম বৃক্ষের পাতা থেকে নাকি নানারকমের রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এই রকম এক বিশ্বাসের প্রভাবে ভারতের কোথাও কোথাও হিন্দুগণ বছরের প্রথম দিনে নিমের পাতা খেয়ে থাকে রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে। হিন্দুগণের কাছে নিমগাছ দেবমন্দিরের অর্ঘ্য হিসাবে নানারকম ক্রিয়া-কর্মে সমাদর লাভ করেছে। ঘটস্থাপন পর্বে বিশেষ করে মহীশূর অঞ্চলে নিমের ডাল বিশেষ অংশ গ্রহণ করে। পূজামণ্ডপে নিমের কয়েকটি ডাল এবং একটি নারকেল নিয়ে তৈরী হয় অর্ঘ্য এবং এ অর্ঘ্যকে কেন্দ্র করে শুরু হয় উৎসব। প্রায় তিন চার দিন ধরে চলে এই ঘটস্থাপন পর্ব। সমাজ জীবনের নানারকম ক্রিয়া-কর্মের মধ্যেই নিম গাছের গুরুত্ব ব্যাপ্তি লাভ করেছিল এক সময়। সুশ্রুত এবং চক্রদত্ত প্রভৃতি চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থে নিমের বিভিন্ন অংশ ফলপ্রদ বলে বর্ণিত আছে। মুসলমানগণ যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন তাঁরা নিমের গুণাবলী দ্বারা আকৃষ্ট হন। পারস্য দেশের Azadarach গাছের নাম অনুসারে তাঁরা নিমগাছের নাম দিয়েছিলেন Azadd-rach-i-Undi। তবে এই গাছের বনৌষধি হিসাবে যা কিছু গুণাগুণ তা তাঁরা জানতে পারেন ভারতভূমি থেকে। নিমের ছালের ব্যবহার ইউরোপ থেকে আগত পর্যটকদের আকৃষ্ট করেছিল। তাই ফ্রা কার্থোলেমি, সোনেবার্ট, গার্শিয়া-দে-অর্তা প্রমুখ লোকের বৃত্তান্তে নিম স্থান পেয়েছিল। কিন্তু নিমের এই গুণাগুণের অন্যতম সমাঝদার

ছিলেন বম্বের ডাঃ হোয়াইট। তাঁর উৎসাহে নিমের বহুল ব্যবহার হয়েছিল গত শতকে।



নিম গাছ

উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানে নিম গাছ এজাডিরেকটা ইণ্ডিকা ( Azadirachta Indica ) নামে পরিচিত। মিলিয়াসি ( Miliaceae ) বংশের এক বিশেষ প্রজাতি নিম। গাছগুলি মাঝারি ধরণের এবং প্রায় ৫০ ফিট পর্যন্ত গাছটি লম্বা হয়। যদিও চির-হরিৎ বলে এই

গাছ বর্ণিত হয় কোথাও কোথাও এ গাছ পর্ণমোচী। নিম গাছের ছাল বেশ মোটা হয়। এর বহিরাবরণ ধূসর এবং ভিতরের দিকটা লালচে। মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে গাছে ফুল ধরে এবং জুন থেকে আগষ্ট মাসের মধ্যে ফল পাকে। ফলগুলি সবুজ ও হলদে রঙের হয় এবং এতে একটি মাত্র বীজ থাকে। ভারতবর্ষে অনেক জায়গায় গাছটি বন্য হিসাবে পাওয়া যায়। কিন্তু কোথাও কোথাও এর চাষ হয়। দাক্ষিণাত্যের কালো মাটি এই গাছ জন্মানোর পক্ষে অনুকূল। শুষ্ক মরুপ্রায় অঞ্চলে যেখানে বারিপাত ১৮ থেকে ৪৫ ইঞ্চি এবং সর্বোচ্চ তাপ প্রায় ১২০ ডিগ্রি ফাঃ সেসব জায়গায় এসব গাছ ভালভাবে জন্মায়। সেজন্য শুষ্ক অঞ্চলে বন সৃষ্টির করার পক্ষে নিম গাছ বিশেষ উপযোগী। নিম গাছ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। নিম তেলের তেতো উপাদানগুলির রাসায়নিক গবেষণা করেছেন বিভিন্ন ভারতীয় বিজ্ঞানী। সুরাসার সহযোগে নিষ্কাশন করে সিদ্দিকি ও মিত্র নিম থেকে কতকগুলি তেতো উপাদান পৃথক করেছেন। এই উপাদানগুলির মধ্যে নিম্বিয়ল ও নিম্বিয়া উল্লেখযোগ্য। নিমগাছের উপর রাসায়নিক গবেষণার জন্য সেনগুপ্ত প্রমুখ রসায়নীগণ পৃথিবীর রসায়নীদের কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করেছেন।

নিমের তেতো উপাদান নিম্বিডিনে সালফার আছে। নিম্বিডিন দিয়ে তৈরী জিনিস বিভিন্ন চর্মরোগে বিশেষ ফলপ্রদ। সেফটিক ঘা, পোড়া ঘা, রক্তপাত জনিত মাড়ির দোষ এবং পাইয়োরিয়াতে এটি বিশেষ উপকারী।

বাকল তিক্ত টনিক। ম্যালেরিয়া জ্বরে এই বাকল বিশেষ ফলপ্রদ বলে কথিত হয়। কিন্তু কলিকাতার ট্রপিক্যাল স্কুলে গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায় যে, এটা বানরের বা মানুষের ম্যালেরিয়াতে কার্যকরী নয়। নিমের পাতাগুলি তেতো এবং এর মৃদু গন্ধ আছে

সাধারণতঃ পাতা শুকিয়ে পুঁথি-পত্রের মধ্যে এই পাতাগুলি রেখে দেওয়া হয় যাতে পুঁথি-পত্র নষ্ট না হয়। পাতা ভেজে তরকারীর সঙ্গে খাওয়া হয় রোগের প্রতিষেধক হিসাবে। গুঁড়ো পাতা পোড়ালে যে গন্ধ বের হয় তা পোকামাকড়ের পক্ষে বিশেষ মারাত্মক। বীজে শতকরা ৪৫ ভাগ তেল থাকে। তেলের চর্বি জাতীয় অ্যাসিড হচ্ছে ওলিয়িক, স্টীয়ারিক, পামিটিক। এছাড়া স্বল্প পরিমাণে আর্কিডিক অ্যাসিড এবং লিনোলিক অ্যাসিডও এতে আছে। মার্গোলিক অ্যাসিড বলে দত্ত ও রায় যে অ্যাসিড পৃথক করেছিলেন সেটা কয়েকটি পরিচিত চর্বি জাতীয় অ্যাসিডের সংমিশ্রণ।

ভারতবর্ষে নিমের তেল সাধারণতঃ ঘানিতে পেষাই করে বের করা হয়। তেল থেকে যে সাবান তৈরী হয় তাতে উগ্র গন্ধ হয় এবং দেখতেও ভাল হয় না। নিমের গন্ধ ও তেতো স্বাদ বিশিষ্ট সাবান বাজারে পাওয়া যায়। নিমের খৈলে যথেষ্ট পরিমাণ প্রোটিন আছে। সার হিসাবে এই খৈল বিশেষ আদরণীয়। নিমের বাকল থেকে যে গঁদ বের হয় সেটা ছোট ছোট খণ্ডে সংগ্রহ করা হয়। এটি অ্যাম্বার রং বিশিষ্ট এবং স্বচ্ছ। সাধারণতঃ খাঁটি গঁদের সঙ্গে এই গঁদ ভেজাল হিসাবে চালান হয়। নিম গাছের উপর ভাগ থেকে একরকম তাড়ি পাওয়া যায়। এই তাড়িতে নিমজাত দুর্গন্ধ থাকে। এতে চিনি শতকরা ১৩-১৫, গ্যালাকট্যান ১২, পেন্টোসান ২৬ এবং খানিকটা অ্যালবুমিন অক্সিডেজ থাকে।

সাধারণতঃ নিমের কাঠ অত্যন্ত ভারী ও মজবুত হয়। শাদা পিঁপড়া এই কাঠকে আক্রমণ করতে পারে না—সম্ভবতঃ এর তেতো উপাদানের জন্য। করাত দিয়ে কাঠ কাটা অসুবিধাজনক এবং এই কাঠ ভাল পালিশ নেয় না।

---

# পেঁয়াজ

বিশ্ববিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডেটাস প্রাচীন এক অনুশাসন থেকে উল্লেখ করেছেন যে, মিশরের বৃহৎ পিরামিড তৈরীর সময় প্রায় ৪২৮,৮০০ পাউণ্ড পেঁয়াজ ও রসুন ব্যবহৃত হয়েছিল কারিগরদের খাবার হিসাবে। পেঁয়াজের ব্যবহার সব্জী ও মশলা হিসাবে অনেকদিন থেকে চলে আসছে। পুরানো পুঁথিপত্রে পাওয়া যায় যে, মিশরে মোজেসের সময়ও পেঁয়াজের প্রচলন ছিল। বাংলাদেশে কৃষকগণের পেঁয়াজ-পান্তা প্রধান খাদ্যের অঙ্গ। গোঁড়া হিন্দুগণ পেঁয়াজ খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতে নারাজ। এছাড়া গত শতকে ইউরোপে পেঁয়াজের খোসা বস্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত হত।

আয়ুর্বেদ ও য়ুনানী শাস্ত্রে পেঁয়াজের কফ্‌জনিত বিভিন্ন রকম উপসর্গে ব্যবহারের নির্দেশ পাওয়া যায়। অনেক বিশারদগণ মনে করেন, পেঁয়াজ মূত্রবৃদ্ধিকারক ও উত্তেজক। গত শতাব্দীর ভারতীয় চিকিৎসকগণ পেঁয়াজের ব্যবহার সম্বন্ধে নানারূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন। শাজাহানপুরের ডাক্তার এফ্. ম্যাককোগি প্রকাশ করেছেন যে, পেঁয়াজের ব্যবহারে আন্ত্রিক স্পন্দন বেড়ে যায়। এছাড়া নানা-রকম রক্তপাতজনিত উপসর্গে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। সরিষা তেলের সঙ্গে নানারকম বাত ব্যাধিতে মালিশ হিসাবে ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন ডাঃ অন্নদাচরণ মুখার্জি। কমলা ও বিস্তৃত প্লীহা রোগেও পেঁয়াজের ব্যবহারের নজীর পাওয়া যায়।

স্কার্ভি রোগে, রক্ত অর্শে এবং আমাশয়ে পেঁয়াজ ব্যবহারের কথা উল্লেখিত আছে। ফিট হলে পেঁয়াজ রোগীর সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে।

ভারতের সর্বত্রই পেঁয়াজ জন্মে। বিভিন্ন ভাষায় এই সব্জী বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দীতে পেঁয়াজ, বাংলাদেশে পেঁয়াজ বা পলাণ্ডু, বোম্বেতে কান্দ, তামিল বা তেলেগুতে নিরুলি নামে পরিচিত। উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানে পেঁয়াজ অ্যালিয়াম সেপা লিন্ (Allium cepa Linn.) নামে পরিচিত।

মাঠে আর বাগানে সব জায়গাতেই পেঁয়াজের চাষ করা সম্ভব। আখ্, হলুদ প্রভৃতি পণ্যের সঙ্গে একই সঙ্গে পেঁয়াজের চাষ করা যায়। ধান, ধনে আর রসুনের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে পেঁয়াজের চাষ করা যেতে পারে। পেঁয়াজের গুল্ম কন্দজাতীয় এবং এগুলি ছু'বছর বেঁচে থাকে। কন্দের উপর দিক লম্বা ফাঁপা এবং সোজা পাতা বেরিয়ে আসে। এই অংশ পেঁয়াজ কলি নামে সব্জী হিসাবে বেশ সমাদৃত। পাতার মাথায় শাদা রঙএর ফুল হয়। পরবর্তীকালে ফুলের মধ্যে ফল এবং কাল রঙের বীচি জন্মে। পেঁয়াজের কন্দ কৃষিজ পণ্য হিসাবে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। মাটির এবং বীজের গুণের উপর নির্ভর করে কন্দের আকার ও রং। বীচি ও কন্দ উভয় থেকেই গাছ জন্মান যায়। যে সব জায়গায় বৃষ্টিতে পেঁয়াজের চারা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে, সেখানে কন্দের সমাদরই বেশী। দক্ষিণ ভারত এবং বাংলাদেশের মৌসুমী ঋতুর শেষ দিক থেকে গরম কালের আগে পর্যন্ত কন্দ বোনা হয়।

পরিমিতভাবে সার দেওয়া দোআঁশ মাটি, শুকনো আবহাওয়া পেঁয়াজের পক্ষে অনুকূল। বপন কিংবা রোপণের পূর্বে ভালভাবে মাটিতে লাঙল দিয়ে ১৫ দিন পর পর জল সেচ করলে অধিক উৎপাদন সম্ভব। এই রকম জল সেচ করলে যমজ কন্দ কম জন্মে। সাধারণতঃ ৯ ইঞ্চি চওড়া সারি করে ৪।৫ ইঞ্চি পর পর কন্দগুলি বুনে দেওয়া হয়। এক একর জমিতে ৭৫০ থেকে ১০০০ পাউণ্ড কন্দ বপন করা হয়। উত্তর ভারতে বীজ থেকে চারা তৈরী করে চারা রোপণ করা হয়। ৮ থেকে

১০ পাউণ্ড বীজ থেকে এক একরের উপযুক্ত চারা প্রস্তুত হয়ে থাকে। চারাগুলি যখন ২।৩ ইঞ্চি লম্বা তখন এগুলি ক্ষেতে রোপণ করা হয়। পেঁয়াজের উপযুক্ত সার হচ্ছে মাছের সার, অ্যামোনিয়া সালফেট, পটাসিয়াম ও সোডিয়াম নাইট্রেট এবং স্থপার ফসফেট।

পেঁয়াজের কন্দগুলি যখন প্রায় পেকে আসে, পেঁয়াজের কলি না ভেঙে মুড়ে দেওয়া হয়। এর ফলে কন্দগুলি বেশ ফুলে উঠতে পারে। যখন পাতাগুলি সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে যায় তখন কন্দগুলি তোলার সময় হয়। ৯০ দিনের মধ্যে পণ্য সংগ্রহ করা হয়। সাধারণতঃ ৭,০০০-১৪,০০০ হাজার পাউণ্ড কন্দ এক একর জমিতে সংগৃহীত হয়। কন্দ থেকে উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ প্রায় ১৫,০০০ হাজার পাউণ্ডের কাছাকাছি হয়। সংগ্রহের পর পেঁয়াজ ঠিক মত শুকিয়ে গুদামজাত করলে বহুকাল রাখা যায়।

ভারতীয় পেঁয়াজের বড় রকমের একটা পোকামাকড়ের আক্রমণের ভয় নেই। সাধারণতঃ কয়েক রকম ছত্রাকের আক্রমণ সচরাচর নজরে আসে। শুকনো ডগা পুড়িয়ে উপযুক্ত পর্যায়ক্রমে চাষ করে এবং গন্ধক ছিটিয়ে ছত্রাকের আক্রমণ রোধ করা যেতে পারে। ন্যাপথালিন আর চূণের মিশ্রণ কিংবা তামাকের নির্যাস ছড়িয়ে থ্রিপসের ( Thrips tabaci Linn ) আক্রমণ থেকে পণ্যগুলিকে বাঁচান যায়। এক রকম গুটিপোকা পেঁয়াজের পাতা খেয়ে ফেলে। সেগুলি হাতে তুলে ফেলে দেওয়া হয়।

সাধারণতঃ ছ'রকমের পেঁয়াজের বেশ কদর। পাটনাই পেঁয়াজ আর তার থেকে বড় রকমের লাল পেঁয়াজ। এ ছাড়া বোম্বাই অঞ্চল থেকে আর একরকম পেঁয়াজ পাওয়া যায়। তার নাম হচ্ছে বোম্বাই পেঁয়াজ। এগুলির খোসা শাদা রকমের আর ঝাল বেশ কম। লাল রকমের পেঁয়াজ অনেকদিন ভাল থাকে, কারণ খোসায় কাটিকল ও

প্রোটোক্যাটচ্যুক অ্যাসিড আছে এবং এগুলি ছত্রাকের পক্ষে মারাত্মক। এ ছাড়া স্পেনীয় বামুর্ডা, স্পটুনের এ-১, ত্রিপোলী প্রভৃতি বিদেশী জাতের পেঁয়াজ বেশ প্রসিদ্ধ।

অনেক কাল থেকেই ইউরোপে পেঁয়াজের খোসা রঞ্জন শিল্পে ব্যবহৃত হতো পাকা হলুদ রং করবার জন্য। পার্কিন ( ১৮৯৬ ) এই খোসা থেকে কোয়ের্সিট্রিন নামক হলদে রঙের এক যৌগিক পদার্থ পৃথক করেছিলেন। কন্দ বা তাজা গাছ থেকে দুর্গন্ধযুক্ত উদ্বায়ী তেল পাওয়া যায়। এই তেলের দুর্গন্ধ অ্যালাইল আইসো-প্রোপাইল ডাইসাইফাইডের প্রভাবে। অধুনা স্টাল এবং নেগেচির গবেষণার ফলে পেঁয়াজের উদ্বায়ী অংশের অনেক উপাদানের কথা জানা গিয়েছে। এই গবেষণার জন্য তাঁরা ব্যবহার করেছেন গ্যাসফেজ ক্রোমাটোগ্রাফির যন্ত্র।

বড় পেঁয়াজে সাধারণতঃ ৮৬·৮% জল, ১·২% প্রোটিন, ১১·৬% শর্করা জাতীয় পদার্থ, ০·১৮% ক্যালসিয়াম, ০·০৪% ফসফরাস, ০·৭% মিলিগ্রাম লৌহ, ২৫ ইউনিট ভিটামিন-এ, ৪০ ইউনিট ভিটামিন-বি, ১১ মিলিগ্রাম % ভিটামিন-সি।

ভারত নিজের চাহিদা মিটিয়েও বেশ কিছু পরিমাণ পেঁয়াজ রপ্তানি করে। বোম্বাই আর মাদ্রাজ থেকে মাল বিদেশে চালান যায়। বেশীর ভাগ মালই যায় জাপান, ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্ট, যুক্ত মালয় রাজ্য, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, হংকং, পূর্ব আফ্রিকা এবং পারস্যে।

———

# বচ্

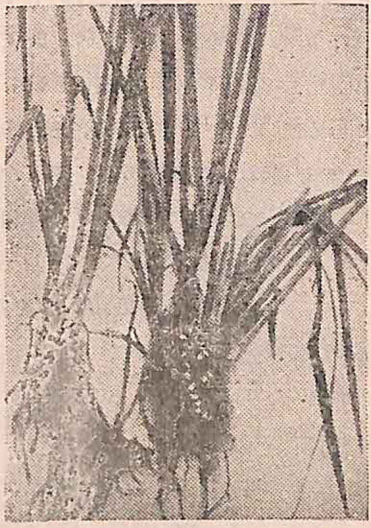
বচ্ দুই রকমের : ঘোরে বচ্ ও লাল বচ্। ঘোরে বচের ভেষজগুণ অনেকেই জানেন।

গত শতাব্দীতে অভিনয় করার পূর্বে স্কটল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের অভিনেতৃগণ বচ্ ব্যবহার করতেন, যাতে তাদের স্বরভঙ্গ কিংবা গলায় কোনও রকম ব্যথা না হয়। গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রেটাসের আমলেও ওষুধ হিসাবে বচের ব্যবহারের উল্লেখ আছে। আয়ুর্বেদে বচের মূলগ্রন্থি ঝাঁঝাল, কোষ্ঠ পরিষ্কারক, মূত্র বৃদ্ধিকারক বলে উল্লেখিত আছে। এ ছাড়া কাশি এবং গলার নানারকম উপসর্গে বচ্ ব্যবহারের নির্দেশ আছে।

গত শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের চিকিৎসকগণ নানারকম অসুখে বচ্ প্রয়োগ করতেন। শ্রীরামপুরের প্রখ্যাত ডাক্তার উমেশচন্দ্র দত্ত পেটের নানারকম অসুখে বচের ব্যবহারের নির্দেশ দিতেন। মীরাটের টি. এন. ঘোষ বলে গেছেন যে, ভাঙ্ ও জোয়ানের সঙ্গে সম-পরিমাণ বচ্ মিশিয়ে বেদনাদায়ক অর্শে ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যায়। বচের গন্ধ নাকি গোখুরা সাপ সহ্য করতে পারে না। বচের গন্ধে সাপের মাদকতা আসে। তাই সাপুড়েরা গোখুরা সাপের আবাসের কাছাকাছি বচের চাষ করে। বক্ষঃপীড়া ও শ্লেষ্মাজনিত নানারকম অসুখে বচ্ ব্যবহারের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। মাদ্রাজের ডাঃ মহীউদ্দিন শরীফের বিবরণী এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডাঃ শরীফ বলেছেন যে, বচ্ পোকামাকড়ের বিরুদ্ধে ব্যবহার করলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

এই বনৌষধি জলাভূমিতে জন্মায়। গাছটি লতায়িত হয় এবং শাখা প্রশাখায় মূলগ্রন্থিতে বিভক্ত এবং বেশ কয়েক বছর বাঁচে। মূলগ্রন্থি

লম্বাকৃতি এবং একটু শক্ত। মূলগ্রন্থির ব্যাস ০·৭৫ থেকে ১ ইঞ্চি হয়। বাইরের অংশের রং পাটকিলে কিংবা ফিকে গেরুয়া, কিন্তু ভিতরটা শাদা ও স্পঞ্জের মত। সাধারণতঃ বচ্ বলে বাজারে যা কেনাবেচা চলে সেটা হচ্ছে বচের মূল ও মূলগ্রন্থি।



বচ

অ্যারাসি ( Araceae ) গোত্রের বিশেষ প্রজাতি বচ্। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে এটি অ্যাকোরাস ক্যালামাস লিন্ (Acorus Calamus Linn) নামে পরিচিত। ভারতের নানা ভাষায় এর নাম বিভিন্ন। পারসী ভাষায় আগর, হিন্দী ও বাংলাতে বচ্, মারাঠী ও গুজরাটিতে ভেখণ্ড তেলেগুতে বশ এবং তামিল ভাষায় বশম্বু, মলয়ালমে ভবম্বু নামে পরিচিত। ইংরাজী ভাষায় বচ্ সুইট ফ্লাগ নামে পরিচিত।

ভারত ও সিংহলের সর্বত্রই এই বনৌষধি জন্মে। প্রায় ৬,০০

হাজার ফিট উঁচু পর্যন্ত হিমালয় অঞ্চলেও এই বনৌষধির চাষ হয়। জলাভূমি ও সিক্ত অঞ্চল এই গাছের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। সাধারণতঃ কাশ্মীরের জলাভূমিতে, মণিপুরের শিরমুরে ও নাগা পর্বতের জলা অংশে এই গাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

বাজারের চাহিদার বেশী অংশ মেটায় বন্য সরবরাহ থেকে পাওয়া বচ্, কিন্তু আবাদি জমির মালও খানিকটা চাহিদা পূরণ করে। মহীশূরের কোরাটিগিরি অঞ্চলে এই মূলগ্রন্থির চাষ করা হয়। বচের চাষের জন্য পলিমাটি বেশ উপযুক্ত। মাঠে জলসেচ করা হয় লাঙল দিয়ে এবং সবুজ সার ব্যবহার করে চাষের উপযুক্ত জমি প্রস্তুত করা হয়। আগের বছরের ফসলের শেষ অংশ এক ফুট পর পর বুনে দেওয়া হয়। এক বছরের মধ্যে ফসল সংগ্রহের উপযুক্ত হয়। এর পর মাটি খুঁড়ে মূলগ্রন্থি সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু অগ্রভাগ রেখে দেওয়া হয় পরবর্তী বছরের ফসল উৎপাদনের জন্য। এর পর মূলগ্রন্থিগুলি রোদে শুকিয়ে বাজারে পাঠানো হয়। এক একর জমি থেকে প্রায় দেড় টন পরিমাণ বাজারের উপযুক্ত মূলগ্রন্থি পাওয়া যায়।

শুকনো মূলগ্রন্থিতে ১·৫ থেকে ৩·৫% হলদে রঙের অ্যারোমেটিক তেল পাওয়া যায়। কেলকার এবং রাও ভারতীয় তেলের বিভিন্ন নিত্যাংশ নিরূপণ করে দেখিয়েছেন। এই ধর্ম নির্ভর করে মূলগ্রন্থি কোন্ এলাকা থেকে সংগৃহীত হয় তার উপর। অ্যাসারোন ও কয়েকটি টারপিন জাতীয় যৌগিক এতে থাকে। খুদা, মুখার্জী ও ঘোষ দেখিয়েছেন যে, বচের তেলের গন্ধ নির্ভর করে ১২৫ ডিগ্রী ফুটনাংক বিশিষ্ট একটি উপাদানের উপর। মূল থেকে অ্যাকরিন নামক গ্ল‌ুকোজ সংলগ্ন যৌগিক পৃথক করা হয়েছে। চেক রসায়নীগণ বচ্ থেকে অ্যাকোরোন নামক একটি যৌগিক পদার্থ পৃথক করেছেন।

---

# বাসক

বিগত শতাব্দীর বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ ইউ. সি. দত্ত তাঁর হিন্দু 'মেটিরিয়া মেডিকা'তে উল্লেখ করেছেন যে, যত দিন বাসক গাছ আছে ততদিন যক্ষ্মা রোগীদের হতাশ হবার কারণ নেই। এই প্রবাদ বাক্যের সত্যতা থাকুক বা না থাকুক বাসক গাছ অতি প্রাচীনকাল থেকেই অন্যতম ভেষজ হিসাবে সমাদর লাভ করে এসেছে। শাঙ্গধর এবং ভাব-



বাসক গাছ

প্রকাশ নামক আয়ুর্বেদ গ্রন্থের উল্লেখ করে ডাঃ দত্ত বাসকের নানারকম ব্যবহারের কথা বলেছেন। সাধারণতঃ হাঁপানি, সর্দি, কাশিতে এই গাছের বিভিন্ন অংশের ব্যবহারের কথা উল্লেখিত হয়েছে। ভারতীয় বনৌষধির পারস্য দেশীয় বিশারদগণেরও এই গাছের ব্যবহারের উপর

আস্থার নজীর পাওয়া যায়। Makhzan-et-Adwiya গ্রন্থের গ্রন্থকার গাছের সঠিক বিবরণ দিয়ে বলেছেন যে, গাছের বাকলগুলো রক্তের উত্তাপ বৃদ্ধিতে এবং গনোরিয়াতে ব্যবহৃত হয়। শিকড় ব্যবহৃত হয় স্বল্প জ্বর, হাঁপানি ও গনোরিয়াতে। বক্ষরোগ ছাড়াও আমাশয়ে বাসকের পাতা ফলপ্রদ বলে গত শতাব্দীতে আমেদাবাদের সার্জন রব অভিমত প্রকাশ করেছেন।

বাসক গাছ উচ্চতায় ছোট। ভারতের ৪০০০ হাজার ফিট উঁচু জায়গা পর্যন্ত প্রায় সর্বত্রই এই গাছ জন্মায়। শীতকালে এই গাছের ফুল ফোটে, কাণ্ড বেশ সোজা মসৃণ আর ছাই রঙের, ফুলগুলি শাদা রঙের, পাতাগুলি চাওড়া বর্শাকৃতির। ভারতের বিভিন্ন অংশে বাসক গাছ বিভিন্ন নামে পরিচিত। তামিল ভাষায় গাছটি অ্যাডাডোডাই বলে অভিহিত হয়। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে গাছটি অ্যাডাটোডা বাসিকা ( Adhatoda Vasica ) নামে পরিচিত। তামিল নাম থেকেই গাছটির এই নামকরণ হয়েছে।

গত শতাব্দীর শেষ দিক থেকে বাসকের পাতার উপর রাসায়নিক গবেষণা চলছে। জলীয় বাষ্পের সঙ্গে পাতন করলে তৈল জাতীয় পদার্থ বার হয়ে আসে। ১৮৮৮ সালে ডাঃ হুপার পাতা থেকে একটি উপক্ষার পৃথক করেছিলেন। তিনি এই উপক্ষারের নাম দিয়েছিলেন ভ্যাসিসিন। ভ্যাসিসিনের আণবিক গঠনের কাজ আরম্ভ হয়েছিল সেন ও ঘোষ প্রমুখ রসায়নীদের দ্বারা। পরবর্তীকালে পৃথিবীর অন্যান্য রসায়নিগণ কর্তৃক এই সমস্যার সমাধান হয়েছে।

ভ্যাসিসিনের প্রভাবে দেহের রক্তচাপ অল্প সময়ের জন্য একটু কমে যায়, কিছুক্ষণ পরেই সেটা ফিরে আসে পূর্বের পর্যায়ে। পাতার নির্যাস কাশি তরল করে এবং বেলেডোনা সহযোগে হাঁপানীতে বেশ উপকারী। ১৯৫৪ সালে ডাঃ আই. সি. চোপরা জম্মু ও কাশ্মীর ইনস্‌টিট্যুটে গবেষণা

করে পাতা থেকে একরকম তেল পেয়েছেন। এই তেল যক্ষ্মারোগ জীবাণু বৃদ্ধি প্রতিরোধ করতে পারে বলে তিনি দাবি করেছেন।

বাসকের কাঠ দিয়ে ভাল কাঠ কয়লা তৈরী হয়। এ ছাড়া পাতা থেকে একরকম হলদে রঙও পাওয়া যায়। বাসকের পাতা অন্যান্য গাছ-গাছড়াকে কীট পতঙ্গের হাত থেকে বাঁচায়। এজন্য বর্ষার পর চাষীরা কোথাও কোথাও ধানের ক্ষেতে বাসকের পাতা ছড়িয়ে দেয়। চাষীরা মনে করে যে, এই পাতা শুধুমাত্র সবুজ সারের কাজ করা ছাড়াও ধান গাছকে পোকা-মাকড় থেকে রক্ষা করে।

———

# বেল

শ্রীফলে তুষ্ট হন মহাদেব। এটা খুব সাধারণ প্রবাদ বাক্য। ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে কিংবা ধর্মগ্রন্থে বিল্বপত্রের নানারকম ব্যবহারের কথা উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু বিদেশী পর্যটকদের কাছ থেকেও বেলের নানারকম ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন ইংরাজ লেখক বেলের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে, বেলপাতা শিব-পূজার অপরিহার্য অর্ঘ্য সামগ্রী। ইউরোপীয় লেখকগণ বেলের নানারকম নামের উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ Cydonia Bengal ensis বা Bengal quince নামে অভিহিত করেছেন। অনেকে এই গাছকে Crataeva religiosa নামে উল্লেখ করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর গার্সিয়া-দ্যা-ওরাতা একে Marmelos de Bengala বলে উল্লেখ করেছেন। গার্সিয়া-দ্যা-ওরাতা বেলের আমাশয়ে ব্যবহারের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। আরবীয় গ্রন্থকার সেরপ্যার গ্রন্থে বেল, ফেল এবং সেল নামক তিনটি ফলের উল্লেখ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট চিকিৎসক অ্যাভেগিল ফেল এবং বেল সমার্থক পদ বলে বিবেচনা করেছেন। মাখজান-এত-আদিয়াতে বেলের হৃদযন্ত্রের উপর ভাল প্রভাবের কথা উল্লেখিত আছে।

বেল উদ্ভিদ বিজ্ঞানে এগেল মারমালোস করিয়া (Aegle marmelos Correa) নামে পরিচিত। গাছগুলি ২০-২৫ ফুট উঁচু এবং ৩-৪ ফুট মোটা হয়। গাছগুলি প্রায়ই সোজা হয় এবং এর ডালে বেশ কাঁটা থাকে। জঙ্গলা এবং কর্ষিত দু'ভাবেই এগুলি দেখা যায়। সমগ্র উপহিমালয় অঞ্চল এবং মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে বেলগাছ প্রচুর

পরিমাণে পাওয়া যায়। উত্তর ভারতে বেলগাছের চাষ হয়। দেশ ভেদে ফল আবার নানারকম হয়।

পাতাগুলি এক সঙ্গে তিনটি করে থাকে। মার্চ থেকে এপ্রিলের মধ্যে ফুল ফোটে এবং ফল ফলতেও আরম্ভ করে। ফলগুলি ডিসেম্বর থেকে পাকতে আরম্ভ করে। অনেক সময় জুন মাস পর্যন্ত গাছে ফল পাওয়া যায়। পাঁচ থেকে আট বছর বয়স থেকেই গাছগুলি ফল দিতে



বেল

থাকে। তবে ২৫ থেকে ৩০ বছরের গাছগুলিই পূর্ণ ফলবতী পর্যায়ের আখ্যা লাভ করে।

বেলগাছের বাকল থেকে কষ বের হয় এবং এই কষ আঠা আঠা হয়ে যায়। পরিমাণে এই আঠা বেশ কম। বীজ থেকেই সবচেয়ে বেশী আঠা পাওয়া যায়। গত শতকে এই আঠা ব্যবহৃত হতো সিমেণ্ট ও রঞ্জক দ্রব্যের ঔজ্জ্বল্য বাড়াবার জন্যে। ওয়াট উল্লেখ করেছেন যে, যোগিগণ ফলের মণ্ড তেলের পরিবর্তে ব্যবহার করেন। এজন্যে একটি

ফল উনুনে উত্তপ্ত করে ফাটিয়ে নিয়ে জলের সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে মণ্ড তৈরী করা হয়। সেই মণ্ড সারা গায়ে মেখে সন্ন্যাসিগণ স্নান করেন। এতে নাকি শরীর খুব স্নিগ্ধ হয়।

ভেষজ হিসাবে বেলগাছের বিভিন্ন অংশের নানারকম গুণের কথা উল্লেখিত আছে। বেলের শিকড়ের ছাল দশমূলারিষ্টের একটি বিশেষ উপাদান। পাতার রস চোখের অসুখ ও নানা প্রকার ক্ষতে ব্যবহৃত হয়। এই রস বেশ তেতো ও ঝাঁঝাল। জ্বর সর্দি ও পিত্তাধিক্যে রস জাল দিয়ে খাওয়ানো হয়। সাধুগণ বেলপাতা চিবিয়ে খান সংযত জীবনের সহায়ক বলে। এতে খাওয়ার ইচ্ছা কমে আসে।

বেলের রাসায়নিক গবেষণা বলতে গেলে আরম্ভ হয়েছে ১৯৩০ সাল থেকে। দিল্লীর শশীভূষণ দত্তই এই কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন। রাসায়নিক গবেষণার বেশীর ভাগই সম্পাদিত হয়েছে বিশিষ্ট উদ্ভিদ রসায়নী ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর সহকর্মীদের দ্বারা। এ থেকে অনেকগুলি কুমারিন জাতীয় যৌগিক পদার্থ পৃথক করা হয়েছে। আম্বেলিফেরন, ইম্পেরেটোরিন, মারমেলোসিন, অ্যালোইম্পেরোটোরিন্, মারমেসিন্, মারমিন হচ্ছে এই যৌগিকগুলির অন্যতম। এর মধ্যে মারমেলোসিন কাঁচা ফলে পাওয়া যায়। পাকবার সময় যৌগিক অ্যালোইম্পেরোটরিনে পরিণত হয়। মারমেলোসিন কোষ্ঠ পরিষ্কারক ও মূত্র বৃদ্ধিকারক। এছাড়া মারমেসিন, আম্বেলিফেরন, মারমিনের অল্প বিস্তর ছত্রাক বৃদ্ধি প্রতিরোধের ক্ষমতা আছে। উপক্ষারের মধ্যে স্কিমিয়াসিন, ফ্যাগারিন এবং এগলিন, এগেলেনিন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া ফলের খোসা থেকে একরকম হলদে রঙ পাওয়া যায়।

———

# ভারতীয় অ্যাকোনাইট

গ্রীক শব্দ অ্যাকোয়ান থেকে এসেছে অ্যাকোনাইট কথাটি। এর অর্থ হচ্ছে তীব্র। হিন্দু ভেষজবিদের কাছে অ্যাকোনাইট অতি বিষ নামে পরিচিত ছিল। বিভিন্ন রকম উপসর্গে বেদনানাশক এবং জ্বর প্রতিরোধক হিসাবে অ্যাকোনাইটের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। আরবীয় ফারমাকোপিয়াতে অ্যাকোনাইট বিষ ( বিখ ) বলে গৃহীত হয়েছিল সুশ্রুত সংহিতা অনুবাদের পর। আরবীর বিশারদদের মধ্যে আবু বইথর প্রথম উল্লেখ করেন যে, বিষ নামক গাছ ভারতে উৎপন্ন হয়। এ ছাড়া হলাহল বলে অ্যাকোনাইট উল্লেখিত হয়েছে কয়েকটি আরবীয় গ্রন্থে। একটি সরিষা পরিমাণ হলাহল একজন লোককে মেরে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট। ইসাবেন আলি নামক একজন গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন যে, হলাহল তেহরী গাড়ওয়াল ও তার পূর্ব অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। আধুনিক পর্যটকদের মধ্যে হ্যামিলটনের অ্যাকোনাইট সম্বন্ধে বিবরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮০২ সালে হ্যামিলটন নেপালের এক বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন, গুর্খাগণ বাইরের শত্রুদের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করবার জন্য সমস্ত নদীর জল বিষাক্ত করে দিত অ্যাকোনাইটের শিকড় দিয়ে। এর ফলে বহির্শত্রুর জল সরবরাহে ভীষণ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হতো।

জর্জ ওয়াটই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতীয় অ্যাকোনাইটের যথাযথ শ্রেণী বিন্যাসের প্রয়োজন; কিন্তু ১৯০৫ সালে ষ্টাফ ভারতীয় অ্যাকোনাইটের শ্রেণী বিভাগ করেন। পৃথিবীর ১১০টি প্রজাতির মধ্যে

২৪টি প্রজাতি ভারতে উৎপন্ন হয়। ষ্টাফ্ এগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করেন।

(১) যে গাছগুলি এক বছর বাঁচে সেগুলিকে বলা হয় জিমনোকোনিটাম।

(২) যেগুলি কয়েক বছর বাঁচে তাদের বলে আইকোকোনিটাম।

(৩) আর যেগুলি দু'বছর বাঁচে সেগুলিকে নেপেলাস শ্রেণীতে ফেলা হয়। নেপেলাস শ্রেণীর আবার কয়েকটি ছোট বিভাগ আছে। ষ্টাফের শ্রেণী বিভাগ বিশেষ কার্যকরী, কিন্তু তাও নির্ভুল নয়। ভারতীয় অ্যাকোনাইটের শ্রেণী বিন্যাসের সংশোধন করেছেন চক্রবর্তী ১৯৫৪ সালে।

অ্যাকোনাইট গাছগুলি প্রায়ই জন্মে হিমালয় অঞ্চলের ৬০০০ হাজার থেকে ১৬,০০০ হাজার ফুট উঁচু এলাকায়। কাশ্মীরে কুমায়ুন, হাজারা, নেপাল ও সিকিম অঞ্চলে এই গাছ জন্মে। পাহাড়ী অঞ্চল থেকে সমভূমিতে অ্যাকোনাইটের সরবরাহ হয় পাহাড়ীদের সাহায্যে। ভারতের তিনটি এলাকায় মাল পৌছায়। হিমালয়ের কাশ্মীর ও হাজারা অঞ্চলের মাল এসে পৌছায় অমৃতসরে। এর মধ্যে চ্যাসমেনথাম ও হেটেরোফাইলাম প্রজাতিই বেশী।

মধ্য হিমালয়ের সরবরাহের বেশীর ভাগ হচ্ছে অ্যাকোনিটাম বেলফ্‌রী আর অ্যাকোনিটাম ডিনোরিয়াম। তৃতীয় এলাকার সরবরাহ নেপাল অঞ্চল থেকে আসে। এগুলি নেপালের অ্যাকোনাইট বলে প্রসিদ্ধ। এর মধ্যে স্পিকাটাম ও ল্যাসিনিয়াটাম প্রজাতিই বেশী।

অ্যাকোনাইট বলে যে ভেষজ বাজারে বিক্রি হয় সেটা হচ্ছে অ্যাকোনাইট গোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রজাতির শিকড়। সারা পৃথিবীতে এই গোষ্ঠীর ১১০টি প্রজাতি ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যে ভারতে আছে

চব্বিশটি। এই চব্বিশটি প্রজাতির তেরটি ভেষজ হিসাবে মূল্যবান। এই তেরটির মধ্যে পাঁচটি প্রজাতির বাজারে কেনাবেচা চলে। এগুলি হচ্ছে হেটেরোফাইলাম, চ্যাসমেনথাম, ফেবক্স, লাইকোক্টেনাম এবং নেপাল অ্যাকোনাইট। ফেবক্স প্রজাতি বলে যে প্রজাতি প্রচলিত সেটা হচ্ছে বেলফুরি ও স্পিকাটামের সংমিশ্রণ।

অ্যাকোনাইটাম হেটেরোফাইলাম হচ্ছে অ্যাকোনাইট গোষ্ঠীর সবচেয়ে পুরানো ব্যবহৃত প্রজাতি। জ্বর ও স্নায়বিক রোগের বিরুদ্ধে এটি ব্যবহৃত হয়। পেটের পীড়া এবং আমাশায় হেটেরোফাইলাম ব্যবহৃত



অ্যাকোনাইট

হয়ে থাকে। এই প্রজাতিতে অ্যাটিসিন নামক বিষক্রিয়াশূন্য উপক্ষার বর্তমান। এছাড়া হেটেরাটিসিন ও হেটেসিন নামক দুটি উপক্ষার আছে। বাজারে বিক্রীত হেটেরোফাইলাম প্রজাতির সঙ্গে শতমূলি ভেজাল হিসাবে মেশানো হয়।

ফেবক্স প্রজাতি ভারতের বাইরে ভারতীয় অ্যাকোনাইট বলে পরিচিত। সাধারণতঃ বাজারে যে ফেবক্স বিক্রি হয় তা ডিনেরিয়াম, বেলফুরী ও স্পিকাটাম প্রজাতির সংমিশ্রণ। এই প্রজাতির শিকড় ব্যবহারের পূর্বে আয়ুর্বেদ চিকিৎসকগণ গোমূত্রে কিংবা দুধের মধ্যে

ভিজিয়ে রাখার নির্দেশ দেন। এর ফলে বনৌষধিটির হৃদযন্ত্রের উপর বিষক্রিয়া অনেকটা কমে আসে। দুধে ভিজিয়ে রাখলেই ভাল ফল পাওয়া যায়। তীরের বিষ হিসাবে এই প্রজাতির ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

অ্যাকোনাইট চ্যাসমেনথাম এবং ইউরোপীয় অ্যাকোনাইট নেপেলাস দেখতে প্রায় একই রকম। পূর্বে এই প্রজাতি ভারতীয় নেপেলাস বলে অভিহিত হতো। এতে উপক্ষারের ভাগ বেশী থাকলেও এর দেহের উপর কার্যকারিতা অনেক কম।

অ্যাকোনিটাম গোষ্ঠীর গাছগুলির মধ্যে বিভিন্ন রকম উপক্ষার রয়েছে। এই উপক্ষারগুলি ষ্টেরয়েড গোষ্ঠীর উপক্ষার বলে খ্যাত। অধুনা এই উপক্ষারগুলির উপর গবেষণার ফলে বিশুদ্ধ রসায়নের জ্ঞান বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। সাধারণতঃ মূলে ০·৩৮ শতাংশ থেকে ০·৮১ শতাংশ উপক্ষার বর্তমান। একমাত্র চ্যাসমেনথাম প্রজাতিতে ৪·৫% উপক্ষার আছে।

উপক্ষারগুলির মধ্যে অ্যাকোনিটিন, ইন্দো অ্যাকোনিটিন, অ্যাটিসিন, লাইকোকটিনিন, হেটেরোঅ্যাটিসিন, হেটেসিন উপক্ষারগুলি অন্যতম।

অ্যাকোনিটামের প্রভাবে স্নায়ুমণ্ডলগুলি প্রথমে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে, পরে এর প্রভাব স্নায়ুমণ্ডলকে অবশ করে তোলে। দেহের ভিতর কিংবা বাইরে স্নায়ুমণ্ডলের অগ্রভাগের কার্যকারিতার ব্যাঘাত ঘটায়। অল্প পরিমাণে হৃদযন্ত্রের উপর কোনও বিষক্রিয়া দেখা যায় না। বেশী পরিমাণের প্রভাবে নাড়ীর গতি ক্ষীণ হয়ে আসে। মালিশ হিসাবে ব্যবহারেও যথেষ্ট বিপদ আছে। যদি ত্বকের অবস্থা সম্পূর্ণ সুস্থ না থাকে তবে অনেকটা ভেষজ শোষিত হয়ে বিপদ সৃষ্টি করতে পারে। তিন মিলিগ্রাম অ্যাকোনিটিনের প্রভাবে একটি ঘোড়া মারা

যায়। অ্যাকোনাইট গোষ্ঠীর অনেক উপক্ষারই প্রায় একই রকম গুণসম্পন্ন।

বাজারে যে সব অ্যাকোনিটামের কেনাবেচা চলে তার মধ্যে ফেবক্স ও চ্যাসমেনথাম প্রজাতি ইউরোপীয় প্রজাতির নেপেলাসের সমকক্ষ। ভারতীয় বাজারের মাল সব সময় প্রামাণিক নয়, কারণ এতে অনেক ভেজাল থাকে। রপ্তানি বাণিজ্যের পক্ষে এটা বেশ ক্ষতিকর।

# রসুন

দ্রব্যগুণবিদ্ পণ্ডিতগণ রসুনকে রসেন নামে অভিহিত করেছেন। তাঁদের মতে রসুনের মধ্যে মধুর, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায় এই পাচটি রস বর্তমান। এর মধ্যে নেই কেবল অম্লরস। সেজন্য এর নাম রসেন। বিশেষজ্ঞদের মতানুসারে রসুনের মূলে কটুরস, পাতায় তিক্তরস, নলে কষায় রস, নলের আগায় লবণ রস এবং বীজে মধুর রস থাকে। পৃথিবীর নানা দেশে রসুন সব্জীর অঙ্গ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আধুনিক রাসায়নিক গবেষণার ফলে জীবাণুনাশক অ্যালিসিন গোষ্ঠীর কয়েকটি যৌগিক রসুন থেকে পৃথক করা হয়েছে। অ্যালিসিনের আবিষ্কার রসায়নের বিভিন্ন শাখার জ্ঞানের উপর বিশেষ আলোক সম্পাত করেছে।

আয়ুর্বেদ ও য়ুনানী শাস্ত্রে কফজনিত বিভিন্ন রোগ, বাত ব্যাধি এবং পাকযন্ত্রের কয়েক রকম রোগে এর ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও রসুন ক্ষয়রোগ প্রতিষেধক বলে অভিহিত হয়েছে। গত শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন জায়গার চিকিৎসকগণ শরীরের নানা রকম উপসর্গে রসুনের ব্যবহার অনুমোদন করেছেন। কলকাতার ডাঃ জি. এ. এমারসন উল্লেখ করেছেন যে, হাঁপানীতে, বাত রোগে ও সাইটিকাতে রসুন বিশেষ ফলপ্রদ। এছাড়া রসুনের প্রলেপ ব্যবহার করলে চুল পাকা কমানো সম্ভব। পুরানো ডিসপেপসিয়া, নানারকম চর্মরোগে রসুনের ব্যবহারের উল্লেখ আছে।

ডাঃ কীর্তিকার ও বসু ( ১৯৩৩ ) উল্লেখ করেছেন যে, রসুনের প্রভাবে বেশি পাচক রস নির্গত হয় এবং তা হজমে সাহায্য করে। রসুন নানারকম বক্ষরোগে বিশেষ ফলপ্রদ। ব্রংকাইটিস ও ক্ষয়রোগে

এই ভেষজ বিশেষ ফলপ্রদ। রসুনের প্রভাবে ক্ষয়রোগে কাশি কমে এবং ক্ষুধা বাড়ে। এতে রোগীর ওজন বাড়তে সাহায্য করে। রজো-নিয়ন্ত্রক হিসাবেও রসুন ব্যবহৃত হয়। রসুন মূত্রাধিক্য সৃষ্টি করে বলে শোথ রোগে এর ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। রসুনের তেল তৈরি করে বাত ব্যাধি এবং প্রস্রাবের পর ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায় বলে ডাঃ কীর্তিকার ও বসু উল্লেখ করেছেন।

লিলিয়াসি গোত্রের অ্যালিয়াম গোষ্ঠীর বিশেষ প্রজাতি রসুন। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে এটি অ্যালিয়াম সাটিভাম্ লিন ( Allium Sativum Linn ) নামে পরিচিত। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় এর নাম বিভিন্ন। সংস্কৃত ভাষায় অরিস্ট, বাংলাভাষায় রসুন, মলয়ালমে তেলাগাদা, তামিল ভাষায় ভেল্লাইপুণ্ডু আর কানাড়ীতে বেল্লুলি নামে অভিহিত হয়। ইংরাজী ভাষায় রসুনকে গারলিক বলা হয়।

রসুন গাছ বেশ কয়েক বছর বাঁচে। গাছটি শক্ত ধরনের। পাতা-গুলি চেপ্টা ও সরু। এগুলি কন্দ থেকে সোজা উঠে আসে। রসুনের কন্দগুলি পেঁয়াজের মত বড় হয় না। অনেক সময় ছোটবড় কন্দ মিশিয়ে থাকে। কন্দগুলির খোসার রং শাদা কিংবা একটু লালচে। পাতার উপর অংশে ফুল হয়। রসুনের গন্ধ পেঁয়াজের গন্ধ থেকে বেশী তীব্র।

বোর্ডো মিকৃশ্চার ছড়িয়ে রসুনকে বিভিন্ন রকম ছত্রাকের আক্রমণ থেকে বাঁচানো যেতে পারে। এছাড়া তামাকের নির্যাস ছড়িয়ে অথবা তামাকের গুঁড়া ছড়িয়ে বোলতা প্রভৃতি কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে ফসলগুলিকে বাঁচানো সম্ভব।

সাধারণতঃ ঠাণ্ডায় এবং শুকনো জায়গায় যেখানে বায়ু চলাচল নিয়মিত হয় সেখানে রসুন মজুত রাখা হয়।

রসুনের রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, এতে প্রোটিন আছে

৬·৩%, চর্বি জাতীয় পদার্থ ০·১%, জলীয় অংশ ৬২·৮%, শর্করা জাতীয় পদার্থ ২৯·০%। এ ছাড়া ক্যালসিয়াম ০·০৩%, ফসফরাস ০·৩১%, লৌহ ১·৩ মিলিগ্রাম শতাংশ এবং ভিটামিন-সি ১৩ মিলিগ্রাম শতাংশ। এ ছাড়া রসুনের মধ্যে তামার অস্তিত্বও প্রমাণিত হয়েছে।

রসুন কন্দ থেকে সাধারণতঃ ০·০৬ থেকে ০·১ শতাংশ উদ্বায়ী তৈল পাওয়া যায়। এর মধ্যে অ্যালাইল প্রোপাইলজাত সালফাইড, ডাই-অ্যালাইল ডাই-সালফাইড বর্তমান। ১৯৪৪ সালে রসুন থেকে অ্যালিসিন নামক যৌগিকের আবিষ্কার হয়েছে। অ্যালিসিনের জীবাণু-বৃদ্ধি প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা কোনও কোনও জীবাণুর বিরুদ্ধে পেনিসিলিনের তুলনায় ১ শতাংশ। রসুন যখন খণ্ড করা হয় তখনই অ্যালিসিনের সৃষ্টি হয়। আসলে অ্যালিন থেকে এনজাইম অ্যালিসিলেজের প্রভাবে অ্যালিসিন সৃষ্টি হয়। অ্যালিসিন পরবর্তী পর্যায়ে ডাই-অ্যালাইল ডাই-সালফাইডে রূপান্তরিত হয়। অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে সেরিন বা মেথিওনিন অ্যালিন বা অ্যালেসিন উৎপন্ন হয় বলে স্টোল প্রমুখ বিজ্ঞানিগণের বিশ্বাস।

পেঁয়াজের মতই রসুনের চাষের জন্য দরকার দোয়াঁশ মাটি। তবে রসুনের জন্য মাটি একটু কাদার মত হওয়া চাই। উঁচু জায়গা (৩০০০-৪০০০ ফিট) হলে আরও ভাল হয়। জন্মাবার কালে রসুনের প্রয়োজন ঠাণ্ডা আর একটু আর্দ্র আবহাওয়া; কিন্তু পাকবার সময় দরকার শুক্‌নো আবহাওয়া।

ছোট ছোট কন্দগুলি সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর মাসে সমভূমিতে বোনা হয়। আর পাহাড়ী অঞ্চলে বোনা হয় ফেব্রুয়ারী থেকে মার্চের মধ্যে। সাধারণতঃ এক একর জমি চাষের জন্য ২৫০ থেকে ৩০১ পাউণ্ড কন্দ বোনা দরকার। দু'মাস পরেই ফসল জন্মাতে থাকে। পেঁয়াজের চেয়ে রসুনের পাকতে খানিকটা বেশি সময় লাগে। সাধারণতঃ ৪ থেকে

৫ মাস লাগে। যখন পাতাগুলি হলদে হতে থাকে আর কন্দগুলি মাটির উপর দিকে একটু একটু দেখা যায়, তখন এগুলি পাকতে আরম্ভ করে। এই সময় কন্দগুলি তুলে বেছে মজুত রাখা হয়। সমভূমির ফসল ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিলের মধ্যে সংগ্রহ করা হয়। এক একর জমিতে ১৫০০ থেকে ২৫০০ পাউণ্ড ফসল জন্মে। বোম্বাই অঞ্চলে এক একরে ৮০০০ থেকে ১০,০০০ পাউণ্ড রস্থন জন্মে। সে সব জায়গায় প্রায় ৭০০ পাউণ্ড বীজ দরকার প্রতি একরে।

দক্ষিণ ভারতে রস্থন পর্যায়ক্রমে রাগী, মরিচ, ভুট্টা, আলু এবং সীমের সঙ্গে বোনা হয়। স্থপার ফসফেট, অ্যামোনিয়াম সালফেট এবং অন্যান্য সার ব্যবহার করলে ফসলের ফলন ভাল হয়।

১৯৫৩ সালে বিখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডাঃ বি মুখার্জী রস্থনের ব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে, ক্ষয়রোগ, ব্রঙ্কাইটিস, শ্বাস-যন্ত্রের ক্ষত, স্বরযন্ত্রের ক্ষত প্রভৃতি রোগে রস্থনের রস ব্যবহারে ভাল পাওয়া যায়।

এছাড়া মালিশ এবং পুলটিস হিসাবে বিভিন্ন রোগে এর ব্যবহারের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। ডাঃ মুখার্জী আরও বলেছেন যে, শিশুদের উপর রস্থনের ব্যবহার বিশেষ বিপজ্জনক।

ভারতীয় ফার্মাকোপিয়াতে সিরাপ অ্যালি বিধি লিপিবদ্ধ হয়েছে। অ্যাসিটিক অ্যাসিড, বিশুদ্ধ জল ও চিনি দিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরী করতে হবে এবং এর পর পরিমিত মাত্রায় রস্থনের রস মিশিয়ে সিরাস অ্যালি তৈরী করা হয়। এতে থাকবে ২ আউন্স রস্থনের রস, ৮ আউন্স চিনি, ২ আউন্স অ্যাসিটিক অ্যাসিড আর বিশুদ্ধ জল ২ আউন্স।

# রাঁধুনী

ইউরোপ এবং আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে রাঁধুনী স্যালাডের উপাদানের প্রয়োজনে চাষ করা হয়। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে রাঁধুনী এপিয়াম গ্র্যাভিওলেনস লিন্ ( Apium Graveolens Linn ) নামে পরিচিত। গাছ সোজা, গুল্ম দু'থেকে তিন ফিট পর্যন্ত লম্বা হয়। ফলগুলি ছোট আকারে ১·১৫ মিলিমিটার × ১ মিলিমিটারের হয়। এই ফলের ভিতরে বীজ থাকে। শীতের দেশে কিংবা পার্বত্য অঞ্চলে গাছ দ্বিবর্ষজীবী। সেখানে দ্বিতীয় বর্ষে গাছ ফল দেয়। এই কোমল উদ্ভিদটি সমভূমিতে বর্ষজীবী এবং প্রথম বছরেই ফল দেয়। শীতল আর্দ্র আবহাওয়া এই গাছের পক্ষে অনুকূল। দোয়াঁশ মাটি এই গাছের পক্ষে ভাল এবং কর্দমাক্ত মাটি এর পক্ষে অনুপযুক্ত। ভাল ফলনের জন্য জমিতে সার দেওয়া এবং সার দিয়ে বেশ কয়েকবার নিড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। আর প্রয়োজন হচ্ছে অপর্যাপ্ত জল। সেজন্য সেচন অপরিহার্য। বাগানের ফসল হিসাবে চাষের জন্য পার্বত্যভূমিতে বীজগুলি মার্চ থেকে এপ্রিল মাসে বোনা হয়। মে মাসে চারাগুলি রোপন করা হয়। নভেম্বর ডিসেম্বরের মধ্যেই ফলন আরম্ভ হয়। পাহাড়ী অঞ্চল থেকে সমভূমিতে সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরের মধ্যে রোপন করা হয়। এর তিন মাসের মধ্যে ফল ধরে।

পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের কোনও অঞ্চলে রাঁধুনীর চাষ হয়। পণ্য আমেরিকাতে চালান যায়। এক একর জমিতে ৮ থেকে ৯ মণ ফল উৎপন্ন হয়।

রাঁধুনী কতকগুলি ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এর মধ্যে

আর্লি ব্লাইট, লেট ব্লাইট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বাগানের কতকগুলি সাধারণ পতঙ্গ এই গাছের পরম শত্রু।

ভারতবর্ষে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে খাবারের সঙ্গে রাঁধুনীর ডাঁটা ও পাতা স্যালাড হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

পাতাতে জলীয় অংশ থাকে শতকরা ৮১ ভাগ। শর্করা জাতীয় পদার্থ ৮·৬%, তৈল জাতীয় ০·৬%, প্রোটিন ৬·০%, ক্যালসিয়াম ০ ২৩%, ফসফরাস, ০·১৪%, লৌহ ৬ ৩ মিলিগ্রাম%। ভিটামিন-এ ৫৮০০. থেকে ৭৫০০ আন্তর্জাতিক একক। এর মূলে খানিকটা আর্সেনিক এবং তামা আছে। রাঁধুনী থেকে অ্যাপিন নামক যৌগিক পদার্থ পাওয়া যায়। এছাড়া গ্লাইকোলিক অ্যাসিড এর অন্যতম উপাদান। রাঁধুনীর ফলে ২-৩ ভাগ ফিকে হলদে উদ্বায়ী তেল আছে। এই তেল বাজারে সিলারী বীজ তৈল নামে পরিচিত। এই তেলের প্রধান প্রধান উপাদান হচ্ছে লাইমোনিন, সোলিনিন, সেডানোনিক অ্যাসিড এবং সেডানোলাইড। শেষোক্ত দুটি উপাদানের উপর উদ্বায়ী তেলের সুগন্ধ নির্ভর করে।

রাঁধুনীর শুকনো পাকা বীজ মশলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি উদ্দীপক এবং স্নায়ুমণ্ডলের টনিক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাতে রাঁধুনীর নিষ্কাশক ব্যবহৃত হয়। রাঁধুনীর চর্বি জাতীয় তেল অ্যান্টি স্পাসমোডিক।

বাতে এবং অন্ত্রের জীবাণুবৃদ্ধি রোধে এটি বিশেষ কার্যকরী ফল বলে সমাদৃত। দেহের মলমূত্র বৃদ্ধিকারক এবং শূল ব্যথায় বিশেষ কার্যকরী। গ্লাইকোলিক অ্যাসিডের উপর নির্ভর করে রাঁধুনীর মূত্রবৃদ্ধি করার ক্ষমতা।

---

# সুপারি

নিত্যব্যবহার্য মশলা ছাড়াও উৎসব ও নানা শুভ কাজে ব্যবহৃত হয়ে ভারতীয় সমাজজীবনে সুপারি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বিয়ের আগে হলুদ কোটায় এয়োদের মধ্যে পান সুপারি আর বাতাসা বিতরণ চিরাচরিত প্রথা। পুরাকালে দুজন রাজপুতের মধ্যে একজন আর একজনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করত রাজদরবারে সুপারি ছুঁড়ে দিয়ে। মঙ্গলের প্রতীক হিসাবে শুধু ভারতবর্ষেই নয় চীনদেশেও সুপারির বেশ কদর ছিল। চীনদেশে সুপারি অতিথিদের আপ্যায়নে ব্যবহৃত হত। এজন্য এর নাম 'পিনলাভ'। 'পিন' কথাটার অর্থ হচ্ছে অতিথি, তা থেকে সুপারির নাম হয়েছে পিনলাভ।

দ্রব্যগুণবিদ্ পণ্ডিতগণ সুপারিকে গুরু, শীতবীর্য, রুক্ষ, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, মদকারক, অগ্নিপ্রদীপক রুচিকারক এবং মুখের বিরসতা-নাশক বলে অভিহিত করেছেন। অপক্ক সুপারি তাঁদের মতে অভিষ্যন্দী, অগ্নি ও দৃষ্টি নাশক। আয়ুর্বেদে নানারকম ব্যবহার ছাড়াও কামেশ্বর মোদকের উপাদান হিসাবে সুপারির বিশেষ প্রয়োগ আছে।

সুপারি গাছের আদি বসতি মালয় বলেই বিবেচিত হয়। ভারতে ও মালয়েই এই গাছ বেশী জন্মে। তবে এশিয়ার অন্যান্য উষ্ণ অঞ্চলেও এই গাছ কিছু কিছু জন্মানো হয়েছে। উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানে সুপারি 'অ্যারেকা ক্যাটচু লিন্' ( Areca Catachu Linn ) নামে পরিচিত। এটি পাম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

ভারতের বিভিন্ন ভাষায় এটি সুপারি, ভক্কা, পাক্কু, আদিকে এবং

আদক নামে অভিহিত হয়। ফলটা অর্থাৎ যেটাকে আমরা সুপারি বলে জানি সেটাকে ইংরাজীতে বলা হয় অ্যারেকা নাট বা বিটল নাট।

সুপারি গাছ সাধারণতঃ সরু এবং ৪০ থেকে ৬০ ফিট লম্বা হয়। সুপারি ফলের খোসা বেশ শক্ত, আঁশযুক্ত আর সবুজ। যখন পাকতে আরম্ভ করে তখন খোসাটা হলদে হতে থাকে, পরে সেটা ধূসর বর্ণে দাঁড়ায়। একটা ফলের ব্যাস সাধারণতঃ এক থেকে দেড় ইঞ্চি।

যদিও সুপারির আদি বসতি মালয় বলে বিবেচিত হয়, সুপারির চাষ চলে সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে, ফিলিপাইনে, ভারতের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে। সমুদ্র উপকূল চাষের সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা হলেও সমুদ্র থেকে ২৫০ মাইল দূরে এবং ৩০০০ ফিট উঁচু জায়গাতেও এর চাষ হয়। সিংহল, মাদাগাস্কার এবং পূর্ব আফ্রিকাতেও যথেষ্ট সুপারির চাষ হয়। ভারতবর্ষে, বাংলাদেশে এবং আসামে কর্ষিত জমির পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। স্বাদে ও আকারভেদে নানা রকমের সুপারি দেখতে পাওয়া যায়। এক রকম স্বাদ ও আকারের যে ব্যতিক্রম ঘটে, সেটা হয় মাটি এবং জাতের প্রকারভেদের জন্য।

আর্দ্র উষ্ণ আবহাওয়া সুপারি চাষের পক্ষে উপযোগী। গাছ বাড়বার সময় শুকনো আবহাওয়া মোটেই সহ্য হয় না। সেজন্য যে অঞ্চলে বৃষ্টি হয় প্রচুর সেখানে এই গাছ বেশী জন্মায়। তবে জলের প্রাচুর্যের সঙ্গে সঙ্গে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থাও থাকা প্রয়োজন। শুষ্ক অঞ্চলে উপযুক্ত পরিমাণ জলসেচ এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকলে সুপারির চাষ সম্ভব হয়। বাড়বার সময় সুপারির চারার ছায়া প্রয়োজন। তাই অঞ্চল ভেদে কোথাও কোথাও মাদার গাছ বা পানের বরজ দিয়ে ছায়া তৈরী করা হয়।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কাদামাটি, কালোমাটি, বালিমাটিতেও

এই গাছ জন্মে। মহীশূরের সুপারির চাষ এবং চাষের পদ্ধতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানকার চাষের পদ্ধতি সমস্ত দক্ষিণ ভারত এবং পশ্চিম অঞ্চলে প্রচলিত। মহীশূরের পার্বত্য অঞ্চল এবং সমভূমির সব জায়গাতেই সুপারির চাষ হয়! পাহাড়ের কাছে বনের পাশে এবং সমভূমিতে জলা কিংবা নদীর ধারে বাগান তৈরী করা হয়। বোনার দু'একদিন আগে শুকিয়ে নিয়ে সুপারির ফল চারাতলায় বুনে দেওয়া হয়। প্রায় দু'বছর পরে অঙ্কুরিত চারা রোপণের উপযুক্ত হয়। সাধারণতঃ এক একর জমিতে ৪০০টি গাছ রোপণ করা হয়। কুড়ি বছর পর আবার নতুন চারা বুনে দেওয়া হয়। সুপারির সারিগুলি থেকে মাঝে মাঝে বুড়ো কিংবা অকেজো গাছগুলিকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এজন্য পুরানো বাগানে এক একর জমিতে ৮০০ থেকে ১২০০ গাছ দেখতে পাওয়া যায়। বর্ষার আগে সুপারির চারার মূলগুলি খুঁড়ে মাটি পাতা ইত্যাদি দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়, যাতে বেশী জল এলে মাটি ধুয়ে গাছগুলির মূল বেরিয়ে না পড়ে।

বাংলাদেশের চাষের পদ্ধতি অন্য রকম। এখানে যত্ন নেওয়া হয় অনেক কম। মহীশূরের সুপারি গাছের ফসল আরম্ভ হয় দশ থেকে বার বছরের মধ্যে, কিন্তু বাংলাদেশে কোথাও কোথাও ছয় থেকে সাত বছর পরই ফল দিতে আরম্ভ করে। সিংহলের সুপারির ফসল আরম্ভ হয় আট বছর থেকেই। এখানকার সুপারিগুলি আকারে ছোট হয়, কিন্তু ফলন বেশী হয়। ত্রিশ বছরে সুপারির ফলন বেশী দাঁড়ায় এবং সাধারণতঃ ৩০ থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত এই রকম চলে। একটা গাছ ষাট থেকে একশ বছর বাঁচে। মহীশূরে এক একর জমিতে প্রায় ৭ হাজার সুপারি জন্মে।

এক একর জমিতে দশ লরী মাঠের সার প্রয়োজন। এছাড়া ৭০০ পাউণ্ড চীনাবাদামের খইল, অ্যামোনিয়াম সালফেট, সুপার

ফসফেট এবং পটাশিয়াম সালফেট বিশেষ উপযোগী। অনেক ক্ষেত্রে সবুজ সার প্রয়োগ করে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়েছে।

মহীশূরের সুপারির দু'রকম ছত্রাকঘটিত রোগ হয়। এর মধ্যে Kole roga ছত্রাকের আক্রমণটাই সবচেয়ে বেশী হয় বম্বের সীমুগা জেলাতে। খুব বৃষ্টিতে রোগ আরম্ভ হয়, কাঁচা সুপারিগুলির উপর ছাতা পড়তে থাকে। বছরে এই রোগের প্রভাবে প্রায় চার লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। কেরোসিনের সংমিশ্রণে বোর্ডো মিকশ্চার ছড়িয়ে এই ছত্রাকের আক্রমণ থেকে গাছ রক্ষা করা যায়।

Anabe roga নামক ছত্রাকের আক্রমণে মূল এবং কাণ্ডের নিচু অংশ আক্রান্ত হয়। এর লক্ষণ চূড়ার বৃদ্ধি কমে এবং পাতাগুলি হলদে হতে থাকে। অনেক সময় বড় বড় গাছও এতে মারা যায়। এর জন্য মৃত বা রোগগ্রস্ত অংশ সরিয়ে সেখানে খানিকটা গন্ধক ছড়ানো হয়। যে মাটিতে চুনের পরিমাণ বেশী সেখানেই রোগটা হয়।

সুপারির ফল সংগ্রহ করে রেখে কিছুদিন পরে দু'টুকরো করে বা গোটা থেকে খোসা ছাড়িয়ে ফেলা হয়। এরপর এগুলিকে সিদ্ধ করা হয় জল দিয়ে। এই জলের মধ্যে আগের বছরের নিষ্কাশনও খানিকটা দেওয়া হয়। এই নিষ্কাশন ছোগাড়্ নামে পরিচিত। দেড় থেকে তিন ঘণ্টা পর্যন্ত সুপারিগুলি সিদ্ধ করা হয় তামার বা মাটির পাত্রে। এর পর শাঁসগুলি শুকিয়ে বাজারে বিক্রি করা হয়। বিভিন্ন রকমের সুপারির মধ্যে রামচন্দ্রপুরের জাত আর দেশবর জাতের কদর বেশ বেশী।

সুপারির রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এতে জল ৩০·৩%, প্রোটিন ৪·৭%, চর্বি ৪·৪%, শর্করা ৪৭·২%, অজৈব পদার্থ ১%, ক্যালসিয়াম ০·০৬%, ফসফরাস ০·১৩%; আয়রন ১·৫ মিলিগ্রাম %।

স্থপারিতে শতকরা ০'১% উপক্ষার এবং ১৪% ট্যানিন ও লাল রঞ্জন দ্রব্য এবং খানিকটা তৈল জাতীয় পদার্থ আছে।

এতে পাঁচটি উপক্ষার আছে। এদের নাম হচ্ছে অ্যারেকোলিন, অ্যারেকোডিন, অ্যারেকোলিডিন, গুভ্যাসিন এবং গুভ্যাকোলিন।

এর মধ্যে অ্যারেকালিনের শরীরের উপর বিষক্রিয়া আছে। এই উপক্ষার স্বল্পক্ষণের জন্য স্নায়ুমণ্ডলের অবসন্ন ভাব আনতে সক্ষম।

সমগ্র ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও মালয়ে পানের সঙ্গে স্থপারি ব্যবহারের প্রচলন আছে। পানে চিবানোর সঙ্গে সঙ্গে লালার স্থষ্টি হয় এবং তার রং হয় লাল। সাধারণতঃ মনে করা হয় এর জন্য দন্তক্ষয় রোধ হয়। কিন্তু চোপরার মত হচ্ছে, বেশী পান খেলে মুখে দূষিত ক্ষতের সম্ভাবনা থাকে। কাঁচা স্থপারির প্রভাবে মাথাধরা, মাথা ঝিম ঝিম করা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। স্থপারি পুড়িয়ে দাঁতের মাজন তৈরী করা হয়। স্থপারির সবুজ ছোবড়া থেকে ট্যানিন জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়।

গ্রামে স্থপারি গাছের কাঠ ব্যবহৃত হয় ঘরের বাটাম, থাম ইত্যাদি তৈরীর জন্য। স্থপারি গাছের চোঙা বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ঘরকন্নার নানারকম কাজে।

ভারতে যে স্থপারি উৎপন্ন হয় তা নিজের চাহিদার পক্ষে অকুলান। এজন্য ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্ট, সিংহল, জাভা প্রভৃতি দেশ থেকে মাল আমদানি করা হয়। তবে কিছু কিছু মাল রপ্তানিও হয় মালের গুণগত বৈষম্যের জন্য।

—